৩য় পারা

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ (٢٥٣)

(২৫৩) এ রসূলগণ, তাদের মধ্যে কাউকে কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।[১] তাদের মধ্যে কারো সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন, আর কাউকে উচ্চ-মর্যাদায় উন্নীত করেছেন। মারয়্যাম-পুত্র ঈসাকে আমি সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রদান করেছি এবং তাকে পবিত্র আত্মা (জিব্রাঈল ফিরিশ্তা) দ্বারা শক্তিশালী করেছি।[২] আর যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন, তাহলে তাদের (নবীদের) পরবর্তী লোকেরা -- তাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পরে -- পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ (যুদ্ধ) করত না। কিন্তু তারা মতভেদ ঘটালো, ফলে তাদের কিছু (লোক) বিশ্বাস করল এবং কিছু অবিশ্বাস করল। আর আল্লাহ ইচ্ছা করলে তারা যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হতো না,[৩] কিন্তু আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই ক'রে থাকেন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خُلَّةٌ وَلا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٥٤)

(২৫৪) হে বিশ্বাসিগণ! আমি তোমাদেরকে যে রুযী দান করেছি, তা থেকে তোমরা দান কর, সেই (শেষ বিচারের) দিন আসার পূর্বে, যেদিন কোন প্রকার ক্রয়-বিক্রয়, বন্ধুত্ব এবং সুপারিশ থাকবে না।[৪] আর অবিশ্বাসীরাই সীমালংঘনকারী।

---

(১) কুরআন অন্য আর এক স্থানেও এ কথা বর্ণনা করেছে। [وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ] "আমি তো কতক পয়গম্বরকে কতক পয়গম্বরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।" *(বানী-ইস্‌রাঈল ৫৫)* কাজেই এ প্রকৃতত্বের ব্যাপারে কোনই সন্দেহ নেই। তবে নবী করীম ﷺ যে বলেছেন, "তোমরা আমাকে নবীদের মাঝে শ্রেষ্ঠত্ব দিও না।" *(বুখারী ৪৬৩৮, মুসলিম ২৩৭৩নং)* এ থেকে একে অন্যের উপর শ্রেষ্ঠত্বের অস্বীকৃতি সাব্যস্ত হয় না, বরং এ থেকে উম্মতকে নবীদের ব্যাপারে আদব ও সম্মান দানের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে যে, তোমরা যেহেতু সে সমূহ বৈশিষ্ট্য ও বিষয়াদি সম্পর্কে অবহিত নও, যার ভিত্তিতে তাঁদের কেউ অন্যের উপর শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হয়েছেন, তাই তোমরা আমার শ্রেষ্ঠত্বও এমনভাবে বর্ণনা করো না, যাতে অন্য নবীদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়। নবীদের পারস্পরিক শ্রেষ্ঠত্ব এবং সমস্ত নবীদের উপর সর্বশেষ নবী ﷺ-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা তো সুসাব্যস্ত বিষয় এবং আহলে সুন্নাহর ঐকমত্যপূর্ণ বিশ্বাস; যা কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। *(আরো বিস্তারিত জানার জন্য দ্রষ্টব্যঃ ফাতহুল ক্বাদীর)*

(২) অর্থাৎ, সেই সব মু'জিযা যা ঈসা ﷺ-কে দেওয়া হয়েছিল। যেমন, মৃতকে জীবিত করা ইত্যাদি। এর বিস্তারিত আলোচনা সূরা আলে-ইমরানে আসবে। 'রূহুল কুদুস' থেকে জিব্রাঈল ﷺ-কে বুঝানো হয়েছে। আর এ কথা পূর্বেও অতিবাহিত হয়েছে।

(৩) এই বিষয়টাকে মহান আল্লাহ কুরআনের কয়েক স্থানে বর্ণনা করেছেন। এর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহর নাযিল করা দ্বীনে মতভেদ পছন্দনীয়। এটা তো আল্লাহর নিকট খুবই অপছন্দনীয়। তাঁর পছন্দনীয় ও সন্তোষজনক জিনিস হল, সমস্ত মানুষ তাঁর নাযিল করা শরীয়তকে অবলম্বন ক'রে জাহান্নামের আগুন থেকে বেঁচে যাক। এই জন্যই তিনি গ্রন্থসমূহ অবতীর্ণ করেন, ক্রমাগতভাবে নবীদেরকে প্রেরণ করেন এবং নবী করীম ﷺ-কে প্রেরণ ক'রে রিসালাতের ইতি টানেন। এর পরও খলীফাগণ, উলামা এবং দ্বীনের আহবায়কদের মাধ্যমে সত্যের প্রতি আহবান, ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা প্রদানের ধারাবাহিকতা জারী রাখা হয় এবং তার গুরুত্বকে তুলে ধরে তার প্রতি তাকীদও করা হয়। এত ব্যবস্থা কেন? এই জন্যই যে, মানুষ যাতে আল্লাহর পছন্দনীয় পথকে অবলম্বন করে। কিন্তু যেহেতু তিনি হিদায়াত ও গুমরাহীর উভয় পথ প্রদর্শন ক'রে দিয়ে মানুষকে কোন একটি পথ অবলম্বন করার জন্য বাধ্য করেননি, বরং পরীক্ষার জন্য তাকে (কোন একটি পথ) নির্বাচন করার ইচ্ছা ও স্বাধীনতা দিয়েছেন, সুতরাং কেউ এই এখতিয়ারের সদ্ব্যবহার ক'রে মু'মিন হয়ে যায়, আবার কেউ এই এখতিয়ারের অসদ্ব্যবহার ক'রে কাফের হয়ে যায়। অর্থাৎ, এটা তাঁর কৌশল ও ইচ্ছা সম্পর্কীয় বিষয়; যা তাঁর সন্তুষ্টি ও পছন্দ থেকে ভিন্ন জিনিস।

(৪) ইয়াহুদী, খ্রিষ্টান এবং কাফের ও মুশরিকরা নিজেদের ইমাম অর্থাৎ, নবী, ওলী, বুযুর্গ এবং পীর-মুরশিদ ইত্যাদিদের ব্যাপারে এই বিশ্বাস রাখত যে, আল্লাহর উপর তাঁদের এত প্রভাব যে, তাঁরা নিজেদের ব্যক্তিত্বের প্রতাপে তাঁদের অনুসারীদের ব্যাপারে যা চাইবেন আল্লাহর কাছ থেকে তা মানিয়ে নিতে পারবেন এবং মানিয়ে নিবেন। আর এটাকেই তারা শাফাআত বা সুপারিশ বলে। অর্থাৎ, প্রায় বর্তমানের অজ্ঞ মুসলিমদের মতই ছিল তাদের আক্বীদা ও বিশ্বাস। এদের (বর্তমানের অজ্ঞদের) কথা হল, আমাদের বুযুর্গরা আল্লাহর কাছে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা নিয়ে বসে যাবেন এবং ক্ষমা করিয়েই উঠবেন। এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর নিকট এ রকম কোন সুপারিশের অস্তিত্বই নেই। এ ছাড়া 'আয়াতুল কুরসী' এবং আরো অনেক আয়াতে ও হাদীসসমূহে বলা হয়েছে যে, সেখানে (কিয়ামতে) এক দ্বিতীয় প্রকারের শাফাআত অবশ্যই হবে, কিন্তু এই শাফাআত কেবল তাঁরাই করতে পারবেন, যাঁদেরকে আল্লাহ অনুমতি দান করবেন। আর এই সুপারিশ কেবল সেই বান্দার জন্যই করতে পারবেন, যার জন্য মহান আল্লাহ অনুমতি দেবেন। তিনি এই অনুমতি কেবল তাওহীদবাদীর জন্যই দেবেন। আর এই সুপারিশ ফিরিশ্তারাও করবেন, নবী-রসূল এবং শহীদ ও সালেহীনরাও করবেন। তবে তাঁদের মধ্যেকার কোন ব্যক্তিত্বের কোন দাপ ও চাপ আল্লাহর উপর থাকবে না। বরং তাঁরাই আল্লাহর ভয়ে এতই ভীত-সন্ত্রস্ত হবেন যে, তাঁদের মুখমন্ডল বিবর্ণ হতে থাকবে। মহান আল্লাহ বলেন, তারা সুপারিশ করে কেবল তাদের জন্য, যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট এবং তারা তাঁর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত। *(সূরা আম্বিয়া ২৮ আয়াত)*

اللهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَلا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (٢٥٥)

(২৫৫) আল্লাহ ; তিনি ব্যতীত অন্য কোন (সত্য) উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সব কিছুর ধারক।[৫] তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্ত তাঁরই। কে আছে যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করবে? তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে, তা তিনি অবগত আছেন। যা তিনি ইচ্ছা করেন, তা ছাড়া তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারে না। তাঁর কুরসী[৬] আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী পরিব্যাপ্ত। আর সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না। তিনি সুউচ্চ, মহামহিম।

لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ

(২৫৬) ধর্মের জন্য কোন জোর-জবরদস্তি নেই। নিশ্চয় সুপথ প্রকাশ্যভাবে কুপথ থেকে পৃথক হয়েছে।[৭] সুতরাং যে তাগূতকে (অর্থাৎ, আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য বাতিল উপাস্যসমূহকে) অস্বীকার

(৫) এটিকে আয়াতুল কুরসী বলা হয়। এর অনেক ফযীলত সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। যেমন, এই আয়াত হল কুরআনের অতীব মহান আয়াত। এটা পড়লে রাতে শয়তান থেকে হিফাযতে থাকা যায়। প্রত্যেক ফরয নামাযের পর পড়লে বেহেশ্ত যাওয়ার পথে মরণ ছাড়া অন্য কিছু বাধা থাকে না। *(ইবনে কাসীর)* এটি মহান আল্লাহর গৌরবময় গুণাবলী, তাঁর সুউচ্চ মর্যাদা এবং তাঁর পরাক্রমশালীতা ও মহানুভবতা সম্বলিত সংক্ষিপ্ত শব্দে বহুল অর্থ বিশিষ্ট অতীব মহান আয়াত।

(৬) 'কুরসী'র অর্থ কেউ বলেছেন, মহান আল্লাহর পা রাখার স্থান। কেউ বলেছেন, জ্ঞান। কেউ বলেছেন, শক্তি ও মাহাত্ম্য। কেউ বলেছেন, রাজত্ব এবং কেউ বলেছেন, আরশ। তবে মহান আল্লাহর গুণাবলীর ব্যাপারে মুহাদ্দেসীন ও সালফে-সালেহীনদের নীতি হল, তাঁর গুণগুলি যেভাবে কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, সেগুলির কোন অপব্যাখ্যা ও ধরন-গঠন নির্ণয় না ক'রে তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। কাজেই এটাই বিশ্বাস করতে হবে যে, এটা সত্যিকারের কুর্সী যা আরশ থেকে পৃথক বস্তু (এবং সঠিক মতে তা আল্লাহর পা রাখার জায়গা)। তার ধরন ও আকৃতি কেমন এবং তাতে মহান আল্লাহ কিভাবে আসীন হন, তা আমরা বর্ণনা করতে পারব না। কেননা, তার অর্থ আমাদের জানা; কিন্তু তার প্রকৃতত্ব আমাদের কাছে অজানা।

(৭) এই আয়াত নাযিল হওয়ার কারণ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আনসারদের কিছু যুবক ছেলেরা ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টান হয়ে গিয়েছিল। পরে যখন আনসাররা ইসলাম গ্রহণ করল, তখন তারা তাদের ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টান হয়ে যাওয়া সন্তানদেরকে ইসলাম গ্রহণের জন্য বাধ্য করতে চাইলে এই আয়াত অবতীর্ণ হল। আয়াত নাযিল হওয়ার কারণের দিকে লক্ষ্য করে কোন কোন মুফাস্সির এটাকে আহলে-কিতাবদের জন্য নির্দিষ্ট মনে করেন। অর্থাৎ, মুসলিম দেশে বসবাসকারী ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানরা যদি জিযিয়া-কর আদায় করে, তাহলে তাদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা যাবে না। তবে এই আয়াতের নির্দেশ ব্যাপক। অর্থাৎ, কাউকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করা যাবে না। কারণ, মহান আল্লাহ হিদায়াত ও গুমরাহী উভয় পথই সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন। তবে কুফ্র ও শির্কের নিষ্পত্তি এবং বাতিল শক্তি চূর্ণ করতে জিহাদ করা এক ভিন্ন ব্যাপার, এটা জোর-জবরদস্তি থেতে পৃথক জিনিস। উদ্দেশ্য সমাজ থেকে এমন শক্তি ও দাপটকে ভেঙ্গে দেওয়া, যা আল্লাহর দ্বীনের উপর আমল করার ও তার তবলীগের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে। যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় স্বাধীন সিদ্ধান্তে ইচ্ছা হলে নিজের কুফ্রীর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে এবং ইচ্ছা হলে ইসলামে প্রবেশ করবে। আর যেহেতু (আল্লার পথে) বাধা দানকারী এই শক্তিসমূহ ক্রমশঃ প্রকাশ পেতেই থাকবে, তাই জিহাদের নির্দেশ এবং তার প্রয়োজনীয়তা কিয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকবে। যেমন হাদীসে এসেছে যে, "জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত জারী থাকবে।" নবী করীম ﷺ নিজেও কাফের ও মুশরিকদের সাথে জিহাদ করেছেন এবং বলেছেন, "আমি ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষের সাথে জিহাদ করার নির্দেশপ্রাপ্ত হয়েছি, যতক্ষণ না তারা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লা-হ'র স্বীকৃতি দেয়।" *(বুখারী ২৫নং)* অনুরূপ মুর্তাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে যাওয়ার শাস্তি (হত্যা)র সাথেও এর কোন বিরোধ নেই। (যা অনেকে মনে ক'রে থাকে।) কেননা, মুর্তাদের শাস্তি (হত্যা)র উদ্দেশ্য জোর-জবরদস্তি নয়, বরং এর লক্ষ্য ইসলামী দেশের আইনের মর্যাদা রক্ষা। একটি ইসলামী দেশে একজন কাফেরকে তার কুফ্রীর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার অনুমতি অবশ্যই দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু একবার সে যদি ইসলামে প্রবেশ ক'রে যায়, তাহলে পুনরায় তাকে ইসলাম বিমুখ হওয়ার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে না। সুতরাং তাকে খুব ভেবে-চিন্তে ইসলামে প্রবেশ করতে হবে। কারণ, যদি এর অনুমতি দেওয়া হয়, তাহলে (দেশের) আইন-শৃঙ্খলার ভিত্তিই ভেঙ্গে পড়বে এবং বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা বিস্তার লাভ করবে। ফলে মুসলিম সমাজের নিরাপত্তার এবং দেশের আইনকে অক্ষুণ্ণ রাখার ব্যাপারে সৃষ্টি হবে বড় বিঘ্ন। তাই যেমন মানবাধিকারের নামে হত্যা, চুরি, ব্যভিচার এবং ডাকাতি করা ইত্যাদি অপরাধের অনুমতি দেওয়া যেতে পারে না, অনুরূপ চিন্তা-স্বাধীনতা বা স্বাধীন সিদ্ধান্তের নামে কোন ইসলামী দেশে আইন ভঙ্গ করার (ইসলাম বিমুখ হওয়ার)ও অনুমতি দেওয়া যেতে পারে না। এটা জোর-জবরদস্তি নয়, বরং মুর্তাদকে হত্যা করা ঐরূপ সুবিচার, যেমন সুবিচার হল হত্যার, লুটতরাজের এবং চারিত্রিক অপরাধে অপরাধী ব্যক্তিকে কঠিন শাস্তি দেওয়া। একটির উদ্দেশ্য দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং দ্বিতীয়টির লক্ষ্য অন্যায় ও অনাচারের হাত হতে দেশকে বাঁচানো। আর উভয় উদ্দেশ্য একটি দেশের জন্য অতীব প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে অধিকাংশ ইসলামী দেশগুলো এই উভয় উদ্দেশ্য ত্যাগ করার কারণে যে অস্থিরতা এবং কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

الْوُثْقَى لا انفِصَامَ لَهَا وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٥٦)

করবে ও আল্লাহকে বিশ্বাস করবে, নিশ্চয় সে এমন এক শক্ত হাতল ধরবে, যা কখনো ভাঙ্গার নয়। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।

اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمْ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنْ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٥٧)

(২৫৭) আল্লাহ তাদের অভিভাবক যারা বিশ্বাস করে (মু'মিন)। তিনি তাদেরকে (কুফরীর) অন্ধকার থেকে (ঈমানের) আলোকে নিয়ে যান। আর যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে, তাদের অভিভাবক হল তাগূত (শয়তান সহ অন্যান্য উপাস্য)। এরা তাদেরকে (ঈমানের) আলোক থেকে (কুফরীর) অন্ধকারে নিয়ে যায়। এরাই দোযখের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنْ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنْ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (٢٥٨)

(২৫৮) তুমি কি সে ব্যক্তির (নমরূদের) কথা ভেবে দেখনি, যে ইব্রাহীমের সাথে তার প্রতিপালক সম্বন্ধে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল? যেহেতু আল্লাহ তাকে রাজত্ব দিয়েছিলেন। যখন ইব্রাহীম বলল, 'তিনি আমার প্রতিপালক যিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান।' সে বলল, 'আমিও জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই।' ইব্রাহীম বলল, 'নিশ্চয় আল্লাহ সূর্যকে পূর্ব দিক থেকে উদিত করেন, তুমি তাকে পশ্চিম দিক থেকে উদিত কর।' তখন সে (নমরূদ) হতবুদ্ধি হয়ে গেল। আর আল্লাহ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْماً فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٢٥٩)

(২৫৯) অথবা সেই ব্যক্তির কথা ভেবে দেখনি, যে এমন এক নগরে উপনীত হয়েছিল, যা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। সে (লোকটি) বলল, 'মৃত্যুর পর কিরূপে আল্লাহ এ (নগরটি)কে জীবিত করবেন?'[৮] তখন তাকে আল্লাহ একশত বৎসর মৃত রাখলেন, তারপর তাকে পুনর্জীবিত করলেন। আল্লাহ বললেন, 'তুমি (মৃত অবস্থায়) কতক্ষণ ছিলে?' সে বলল, 'একদিন অথবা এক দিনের কিছু অংশ।'[৯] তিনি বললেন, 'বরং তুমি একশত বৎসর (মৃত অবস্থায়) অবস্থান করেছিলে। অথচ তোমার খাদ্য-সামগ্রী ও পানীয় বস্তুর প্রতি লক্ষ্য কর, তা অবিকৃত রয়েছে। আর তুমি তোমার গাধাটির প্রতি লক্ষ্য কর, (এগুলো এ জন্য যে,) আমি তোমাকে মানব-জাতির জন্য নিদর্শনস্বরূপ করব। আর (গাধার) অস্থিগুলির প্রতি লক্ষ্য কর, কিভাবে সেগুলিকে আমি সংযোজিত করি, অতঃপর মাংস দ্বারা ঢেকে দিই।' সুতরাং যখন এটি তার নিকট সুস্পষ্ট হল, তখন সে বলে উঠল, 'আমি জানি যে, আল্লাহ সর্ব বিষয়ে মহাশক্তিমান।'[১০]

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ

(২৬০) আরো (স্মরণ কর) যখন ইব্রাহীম বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! কিভাবে তুমি মৃতকে জীবিত কর, আমাকে

---

(৮) أَوْ كَالَّذِيْ এর সম্পর্ক হল পূর্বের ঘটনার সাথে। অর্থ হল, তুমি কি (পূর্বের ঘটনার ন্যায়) সেই ব্যক্তির কথা ভেবে দেখনি, যে এমন এক নগরে উপনীত হয়েছিল ---। এই লোকটি কে ছিল? এ ব্যাপারে বহু উক্তি বর্ণিত হয়েছে। আর উযায়রের নাম সর্বাধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। কোন কোন সাহাবী ও তাবেয়ীর উক্তিও এ ব্যাপারে উদ্ধৃত হয়েছে। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত। পূর্বের (ইব্রাহীম ﷺ ও নমরূদের) ঘটনা ছিল মহান স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণে এবং এই দ্বিতীয় ঘটনা হল মহান আল্লাহর মৃতকে জীবিত করার মহাশক্তির প্রমাণে। যে সত্তা এই লোকটিকে এবং তার গাধাকে একশ' বছর পর জীবিত করেছেন, এমন কি তার খাদ্য-পানিও নষ্ট হতে দেননি, সেই মহান সত্তাই কিয়ামতের দিন মানবকুলকে পুনরায় জীবিত করবেন। যিনি একশ' বছর পর জীবিত করতে পারেন, তাঁর জন্য হাজার বছর পর জীবিত করাও কোন কষ্টকর ব্যাপার নয়।

(৯) কথিত আছে যে, যখন উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেছিল, তখন কিছুটা বেলা উঠে গিয়েছিল এবং যখন পুনরায় জীবিত হল, তখন সন্ধ্যা হতে কিছুটা বাকী ছিল। এ থেকে সে অনুমান করেছিল যে, আমি যদি গতকাল এসে থাকি, তাহলে এক দিন অতিবাহিত হয়ে গেছে, আর যদি এটা আজকের ঘটনা হয়, তবে দিনের কিছু অংশ অতিবাহিত হয়েছে। অথচ প্রকৃত ব্যাপার হল তার মৃত্যুর উপর একশ' বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে।

(১০) অর্থাৎ, বিশ্বাস তো আমার আগেও ছিল। এখন প্রত্যক্ষ দর্শন করে আমার প্রত্যয় ও জ্ঞানে আরো দৃঢ়তা এসেছে এবং তা বর্ধিত হয়েছে।

দেখাও।’[১১] তিনি বললেন, ‘তুমি কি এ বিশ্বাস কর না?’ সে বলল, ‘অবশ্যই (বিশ্বাস করি)। কিন্তু আমার মনকে প্রবোধ দানের জন্য (দেখতে চাই)!’ তিনি বললেন, ‘তবে চারটি পাখী ধর এবং ঐগুলিকে (পুষে) তোমার বশীভূত কর (তা যবেহর পর টুকরা-টুকরা ক’রে সম্মিলিত কর)। তারপর তাদের এক এক অংশ এক এক পাহাড়ে স্থাপন কর। অতঃপর ঐগুলিকে ডাক দাও, (দেখবে,) ঐগুলি দ্রুতগতিতে তোমার নিকট এসে উপস্থিত হবে। আর জেনে রাখ যে, আল্লাহ প্রবল পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।’

تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنْ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْياً وَاعْلَمْ أَنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٦٠)

(২৬১) যারা আল্লাহর পথে ব্যয় করে, তাদের উপমা একটি শস্য-বীজের মত, যা থেকে সাতটি শীষ জন্মে, প্রতিটি শীষে থাকে একশত শস্য-দানা। আর আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা বহুগুণে বৃদ্ধি ক’রে দেন।[১২] আল্লাহ মহাদানশীল, মহাজ্ঞানী।

مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٢٦١)

(২৬২) যারা আল্লাহর পথে আপন ধন ব্যয় করে, অতঃপর যা ব্যয় করে, তার কথা বলে বেড়ায় না এবং (ঐ দানের বদলে কাউকে) কষ্টও দেয় না,[১৩] তাদের পুরস্কার রয়েছে তাদের প্রতিপালকের নিকট, বস্তুতঃ তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।

الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ لا يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنّاً وَلا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (٢٦٢)

---

(১১) এটা মৃতকে জীবিত করার দ্বিতীয় ঘটনা, যা দেখানো হয়েছিল একজন অতীব সম্মানিত পয়গম্বর ইব্রাহীম ﷺ-এর আশা পূরণের এবং তাঁর আন্তরিক প্রশান্তি লাভের জন্য। চারটি কোন্ কোন্ পাখি ছিল? মুফাস্সিরগণ বিভিন্ন নাম উল্লেখ করেছেন। তবে নাম নির্দিষ্টীকরণে কোন লাভ নেই। এই কারণেই মহান আল্লাহ তাদের নামের উল্লেখ করেননি। চারটি বিভিন্ন প্রকারের পাখি ছিল। فَصُرْهُنَّ এর একটি অর্থ করা হয়েছে, أَمِلْهُنَّ (আকৃষ্ট করে নাও) অর্থাৎ, পোষ মানিয়ে নাও। যাতে জীবিত হওয়ার পর সহজেই চিনে নিতে পারো যে, এগুলো সেই পাখিই এবং কোন প্রকারের সন্দেহের অবকাশ না থাকে। তবে এই অর্থে ثُمَّ قَطِّعْهُنَّ (অতঃপর সেগুলোকে টুকরা টুকরা কর) শব্দ উহ্য মেনে নিতে হবে। দ্বিতীয় অর্থ করা হয়েছে, قَطِّعْهُنَّ (সেগুলোকে টুকরা টুকরা করে নাও)। এই অর্থে কোন কিছু উহ্য না মেনেও মানে পরিষ্কার হয়ে যায়। অর্থাৎ, সেগুলোকে টুকরা টুকরা ক’রে তাদের অংশগুলো একে অপরের সাথে মিশ্রিত ক’রে বিভিন্ন পাহাড়ে রেখে দাও। অতঃপর সেগুলোকে ডাকো, দেখবে তারা জীবিত হয়ে তোমার কাছে চলে আসবে। ঠিক তা-ই হল। পূর্বের ও বর্তমানের কোন কোন মুফাস্সিরগণ (যাঁরা সাহাবী ও তাবেঈনদের তাফসীরের এবং সালফে-সালেহীনদের তরীকার কোন গুরুত্ব দেন না তাঁরা) فَصُرْهُنَّ এর অনুবাদ কেবল ‘পোষ মানিয়ে নাও’ করেছেন। আর পাখিগুলোকে যবেহ করার পর টুকরা টুকরা ক’রে পাহাড়ে তার অংশগুলো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দেওয়ার, তারপর মহান আল্লাহর মহাশক্তি দ্বারা সেগুলোর আপোসে জোড়া লাগার কথা স্বীকার করেন না। বলা বাহুল্য এ অনুবাদ সঠিক নয়। এ রকম অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করলে ঘটনার সমস্ত অলৌকিকতাই শেষ হয়ে যায় এবং মৃতকে জীবিত ক’রে দেখানোর প্রশ্ন থেকেই যায়। অথচ এই ঘটনাকে উল্লেখ করার উদ্দেশ্যই হল, মহান আল্লাহর মৃতকে জীবিত করার গুণ ও তাঁর মহাশক্তিকে প্রমাণ করা। একটি হাদীসে নবী করীম ﷺ ইব্রাহীম ﷺ-এর এই ঘটনার উল্লেখ ক’রে বলেছেন, “আমরা ইব্রাহীম ﷺ অপেক্ষা সন্দেহ করার অধিকার বেশী রাখি।” *(বুখারী ৩৩২৭নং)* আর এর অর্থ এই নয় যে, ইব্রাহীম ﷺ আল্লাহর কুদরতে সন্দেহ পোষণ করেছিলেন, অতএব সন্দেহ করার অধিকার তাঁর চেয়ে আমাদের বেশী; বরং উদ্দেশ্য হল, তাঁর যে সন্দেহ হতে পারে তার খন্ডন করা। অর্থাৎ, ইব্রাহীম ﷺ মৃতকে জীবিত করার ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহ করেননি। যদি তিনি এ ব্যাপারে সন্দেহ ক’রে থাকতেন, তাহলে অবশ্যই সন্দেহ করার ব্যাপারে আমাদের অধিকার তাঁর চেয়ে বেশী হত। *(অধিক জানার জন্য দ্রষ্টব্য ঃ ফাতহুল ক্বাদীর)*

(১২) এটা হল আল্লাহর পথে ব্যয় করার ফযীলত। ‘আল্লাহর পথ’-এর উদ্দেশ্য যদি জিহাদ হয়, তাহলে তার অর্থ হবে জিহাদে ব্যয়কৃত টাকা-পয়সার এই নেকী পাওয়া যায়। আর যদি এর উদ্দেশ্য হয় সমস্ত কল্যাণের পথ, তবে এই ফযীলত হবে নফল সাদক্বা-খয়রাতের। আর অন্যান্য নেকীসমূহ (একটি নেকীর প্রতিদান দশগুণ)এর আওতাভুক্ত হবে। *(ফাতহুল ক্বাদীর)* অর্থাৎ, সাদক্বা-খয়রাতের সাধারণ প্রতিদান ও নেকী অন্যান্য কল্যাণকর কাজের চেয়ে বেশী। আর আল্লাহর পথে ব্যয় করার গুরুত্ব ও ফযীলত এত বেশী হওয়ার কারণ হল, যতক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধসামগ্রী ও অস্ত্র-শস্ত্রের ব্যবস্থা না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সৈন্যের পারদর্শিতাও শূন্যের কোটায় থাকবে। আর যুদ্ধসামগ্রী ও অস্ত্র-শস্ত্রের ব্যবস্থা টাকা-পয়সা ব্যতীত করা যেতে পারে না।

(১৩) আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় বা দান করার উল্লিখিত ফযীলত কেবল সেই ব্যক্তিই লাভ করবে, যে স্বীয় সম্পদ দান ক’রে অনুগ্রহ প্রকাশ করবে না এবং সে মুখ দিয়ে এমন কোন তুচ্ছ বাক্যও বের করবে না, যা কোন গরীব-অভাবীর সম্মানে আঘাত হানে এবং সে তাতে ব্যথা অনুভব করে। কেননা, এটা এত বড় অপরাধ যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, “কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ তিন শ্রেণীর মানুষের সাথে কথা বলবেন না। তাদের মধ্যে একজন হল, (দান ক’রে) অনুগ্রহ প্রকাশকারী ব্যক্তি।” *(মুসলিম ১০৬নং)*

قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ (٢٦٣)

(২৬৩) যে দানের পশ্চাতে (যাঞ্চাকারীকে) কষ্ট দেওয়া হয়, তার চেয়ে (তাকে) মিষ্টি কথা বলা এবং ক্ষমা করা উত্তম।[১৪] আর আল্লাহ অভাবমুক্ত, পরম সহনশীল।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأَذَى كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْداً لا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (٢٦٤)

(২৬৪) হে বিশ্বাসিগণ! দানের কথা প্রচার ক'রে এবং কষ্ট দিয়ে তোমরা তোমাদের দানকে নষ্ট ক'রে দিও না; ঐ লোকের মত যে নিজের ধন লোক দেখানোর জন্য ব্যয় করে এবং আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে না। তার উপমা একটি শক্ত পাথরের মত, যার উপর কিছু মাটি থাকে। অতঃপর তার উপর প্রবল বৃষ্টিপাত তাকে মসৃণ করে রেখে দেয়।[১৫] যা তারা উপার্জন করেছে, তার কিছুই তারা তাদের কাজে লাগাতে পারবে না। বস্তুতঃ আল্লাহ অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللهِ وَتَثْبِيتاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٦٥)

(২৬৫) পক্ষান্তরে, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এবং নিজের হৃদয়কে শক্তিশালী করার জন্য তাদের ধন দান করে, তাদের উপমা কোন উঁচু ভূমিতে অবস্থিত একটি বাগান,[১৬] যাতে মুষলধারে বৃষ্টি হয়, ফলে তার ফল-মূল দ্বিগুণ জন্মে। যদি মুষলধারে বৃষ্টি নাও হয়, তবে হাল্কা বৃষ্টিই যথেষ্ট। বস্তুতঃ তোমরা যা কর, আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।

أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ

(২৬৬) তোমাদের কেউ কি চায় যে, তার খেজুর ও আঙ্গুরের একটি বাগান থাকুক, যার নিচে নদী প্রবাহিত এবং যাতে সকল প্রকার ফল-মূল আছে, আর সে ব্যক্তি বার্ধক্যে উপনীত হয় এবং তার অসহায় দুর্বল সন্তান-সন্ততি থাকে। (এমন অবস্থায়) ঐ (বাগান)টিকে এক অগ্নিক্ষরা ঘূর্ণিঝড় আক্রমণ করে ও তা জ্বলে (ধ্বংস হয়ে) যায়?[১৭] এভাবে আল্লাহ তাঁর সকল নিদর্শন তোমাদের

(১৪) ভিক্ষুকের সাথে নম্রভাবে ও দয়ামাখা স্বরে কথা বলা অথবা দুআ-বাক্য (আল্লাহ তাআ'লা তোমাকে ও আমাকে তাঁর অনুগ্রহ ও করুণা দানে ধন্য করুন! ইত্যাদি) দ্বারা তাকে উত্তর দেওয়াই হল 'মিষ্টি বা উত্তম কথা'। আর 'ক্ষমা করা'র অর্থ হল, ভিক্ষুকের অভাব-অনটন ও তার প্রয়োজনের কথা মানুষের সামনে প্রকাশ না ক'রে তা গোপন করা। অনুরূপ ভিক্ষুকের মুখ দিয়ে যদি কোন অনুচিত কথা বেরিয়ে যায়, তা ক্ষমা করে দেওয়াও এর আওতাভুক্ত। অর্থাৎ, ভিক্ষুকের সাথে নম্রভাবে দয়ামাখা স্বরে কথা বলা, তাকে ক্ষমা করা এবং তার (ব্যাপার) গোপন করা সেই সাদক্বার চেয়ে উত্তম, যে সাদক্বা করার পর (যাকে সাদক্বা দেওয়া হয়) তাকে মানুষের সামনে অপমানিত ক'রে কষ্ট দেওয়া হয়। এই জন্যই হাদীসে বলা হয়েছে, "উত্তম কথা সাদক্বার সমতুল্য।" *(মুসলিম ১০০৯নং)* অনুরূপ নবী করীম ﷺ বলেছেন, "তুমি কোনও নেকীর কাজকে তুচ্ছ ভেবো না, যদিও তা তোমার কোন ভায়ের সাথে হাসি মুখে সাক্ষাৎ করার মাধ্যমে হয়।" *(মুসলিম ২৬২৬নং)*

(১৫) এখানে প্রথমতঃ বলা হয়েছে যে, সাদক্বা-খয়রাত ক'রে অনুগ্রহ প্রকাশ করা (বা বলে বেড়ানো) এবং (খোঁটা মেরে) কষ্টদায়ক বাক্যালাপ ঈমানদারদের অভ্যাস নয়, বরং তা হল মুনাফেক্ব ও তাদের অভ্যাস, যারা লোক প্রদর্শনের জন্য ব্যয় করে। দ্বিতীয়তঃ এ রকম ব্যয় করার দৃষ্টান্ত এমন পরিষ্কার পাথরের মত যার উপর থাকে কিছু মাটি, কোন মানুষ ফসলাদি লাভের আশায় তাতে বীজ ফেলে দেয়, কিন্তু বৃষ্টির এক ঝাপটেই সমস্ত মাটি ধুয়ে নেমে যায় এবং পাথর মাটি থেকে একেবারে পরিষ্কার ও মসৃণ হয়ে যায়। অর্থাৎ, যেমন বৃষ্টি এই পাথরের জন্য কোন ফলপ্রসূ হয় না, অনুরূপ লোকপ্রদর্শনকারীর সাদক্বাও তার জন্য কোন লাভ বয়ে আনে না।

(১৬) এটা সেই ঈমানদারদের দৃষ্টান্ত, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য দান ক'রে থাকে। তাদের দানকৃত সম্পদ সেই বাগানের মত, যা কোন উঁচু জায়গায় অবস্থিত, তাতে প্রবল বৃষ্টি হলে দ্বিগুণ ফসল দেয়। আর প্রবল বৃষ্টি না হলেও হাল্কা বর্ষণ এবং শিশিরও তার জন্য যথেষ্ট হয়। অনুরূপ তাদের সাদক্বা-খয়রাত যতই কম হোক না কেন আল্লাহর নিকট তা কয়েক গুণ প্রতিদান ও নেকীর কারণ হবে। 'জান্নাত' বা বাগান এমন ভূমিকে বলা হয়, যাতে এত সংখ্যায় বৃক্ষাদি থাকে যে তা পুরো ভূমিকে ঢেকে নেয়। অথবা 'জান্নাত' এমন বাগান যার চতুর্দিক এমনভাবে ঘেরা-বেড়া থাকে যে, তার ফলে বাগান দৃষ্টিগোচর হয় না। جَنَّة জান্নাত শব্দটি جـــنّ ধাতু থেকে গঠিত, (যার অর্থ ঢাকা বা অদৃশ্য হওয়া)। এ জন্যই জ্বিন এমন সৃষ্টির নাম যা দেখা যায় না। পেটের শিশুকেও 'জানীন' বলা হয় কারণ তাও দেখা যায় না। পাগলামিকে 'জুনুন' বলে আখ্যায়িত করা হয়, কারণ তার বুদ্ধির উপর পর্দা পড়ে যায়। আর জান্নাতকেও এই জন্যই জান্নাত বলা হয় যে তা রয়েছে দৃষ্টির অগোচরে। رَبـــوَة উঁচু ভূমিকে বলে। আর وَابِل অর্থ প্রবল বৃষ্টি।

(১৭) লোক প্রদর্শন তথা সুনাম নেওয়ার উদ্দেশ্যে কোন কাজ করার ক্ষতিসমূহের কথা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়ার জন্য এবং তা থেকে মানুষকে দূরে রাখার জন্য এখানে আরো একটি দৃষ্টান্ত পেশ করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, যেমন কোন মানুষের একটি বাগান

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (٢٦٦)

জন্য সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেন, যাতে তোমরা চিন্তা-ভাবনা করতে পার।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (٢٦٧)

(২৬৭) হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমি জমি হতে তোমাদের জন্য যা উৎপাদন ক'রে থাকি, তা থেকে যা উৎকৃষ্ট, তা দান কর।[১৮] এমন মন্দ জিনিস দান করার সংকল্প করো না, যা তোমরা মুদিত চক্ষু ব্যতীত গ্রহণ কর না।[১৯] আর জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمْ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلاً وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٢٦٨)

(২৬৮) শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং জঘন্য কাজে উৎসাহ দেয়,[২০] পক্ষান্তরে আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। আল্লাহ বিপুল দাতা, সর্বজ্ঞ।

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ

(২৬৯) তিনি যাকে ইচ্ছা প্রজ্ঞা দান করেন, আর যাকে প্রজ্ঞা[২১]

আছে। সে বাগানে সব রকমের ফল-ফসল হয়। (অর্থাৎ, তাতে সম্পূর্ণ আয় হওয়ার আশা থাকে।) এখন এই লোকটি বার্ধক্যে পৌঁছে গেল। তার আছে ছোট ছোট সন্তান-সন্ততি। (অর্থাৎ, বার্ধক্য এবং বয়সের ভারের কারণে সে মেহনত-পরিশ্রম করা থেকে অক্ষম হয়ে গেছে। এখন এই ছোট ছোট দুর্বল সন্তান দ্বারা তার বার্ধক্যে সহযোগিতা পাওয়া তো দূরের কথা, তারা তো নিজেদের ভারই বহন করার ক্ষমতা রাখে না।) এমতাবস্থায় একটি ঘূর্ণিবায়ু এসে তার বাগানকে ভস্মীভূত করে দিল। এখন না সে পুনরায় উক্ত বাগানকে আবাদ করার ক্ষমতা রাখে, আর না তার সন্তানরা। কিয়ামতের দিন লোককে দেখানোর জন্য ব্যয়কারীদের অবস্থা ঠিক এই রকমই হবে। মুনাফেক্বী ও কপটতার কারণে তাদের সমস্ত নেক আমল নষ্ট হয়ে যাবে; কোন উপকারে আসবে না। অথচ সেখানে নেকীর বড়ই প্রয়োজন হবে এবং পুনরায় নেকীর কাজ করারও কোন সুযোগ থাকবে না। মহান আল্লাহ বলছেন, তোমরা কি চাও যে, তোমাদের এ রকম অবস্থা হোক? ইবনে আব্বাস এবং উমার (রাযীআল্লাহু আনহুমা) এমন লোকদেরকেও উক্ত দৃষ্টান্তের আওতাভুক্ত মনে করেন, যারা সারা জীবন নেকী অর্জন করে এবং শেষ জীবনে শয়তানের জালে ফেঁসে গিয়ে আল্লাহর অবাধ্যতা ক'রে সারা জীবনের নেকীকে নষ্ট করে ফেলে। *(সহীহ বুখারী, তাফসীর অধ্যায়ঃ ফাতহুল ক্বাদীর ও তাফসীরে ত্বাবারী)*

([১৮]) সাদক্বা কবুল হওয়ার জন্য যেমন জরুরী হল যে, তা অনুগ্রহ প্রকাশ, কষ্ট দেওয়া এবং কপটতা থেকে পাক হতে হবে, (যেমন পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছে) অনুরূপ এটাও জরুরী যে, তা হালাল ও পবিত্র উপার্জন থেকে হতে হবে। তাতে তা ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে হোক অথবা জমি ও বাগান থেকে উৎপন্ন ফসল ও ফলাদির মাধ্যমে হোক। আর "মন্দ জিনিস--" কথার প্রথম অর্থ হল, এমন জিনিস যা অবৈধ পথে উপার্জন করা হয়েছে। মহান আল্লাহ তা কবুল করেন না। হাদীসে এসেছে, "আল্লাহ পবিত্র। তাই তিনি কেবল পবিত্র জিনিসই কবুল করেন।" এর দ্বিতীয় অর্থ হল, খারাপ ও অতি নিম্নমানের জিনিস। নষ্ট হয়ে যাওয়া খারাপ জিনিসও যেন আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় না করা হয়। আর [لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ] আয়াতের দাবীও তা-ই। এই আয়াত নাযিল হওয়ার কারণ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, মদীনার কোন কোন আনসার সাহাবী খারাপ হয়ে যাওয়া নিম্নমানের খেজুরগুলো সাদক্বা স্বরূপ মসজিদে দিয়ে যেতেন। যার ফলে এই আয়াত নাযিল হয়। *(ফাতহুল ক্বাদীরঃ তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ ইত্যাদি)*

([১৯]) অর্থাৎ, যেমন তুমি নিজের জন্য নষ্ট হয়ে যাওয়া খারাপ জিনিস নিতে পছন্দ করো না, অনুরূপ আল্লাহর পথেও ভাল ছাড়া খারাপ জিনিস ব্যয় করো না।

([২০]) অর্থাৎ, সৎ পথে মাল ব্যয় করতে চাইলে শয়তান নিঃস্ব ও কাঙ্গাল হয়ে যাওয়ার ভয় দেখায়। কিন্তু অন্যায় পথে ব্যয় করার সময় এই ধরনের কোন আশঙ্কা মনে আসতেই দেয় না; বরং মন্দ কাজগুলোকে এত সুন্দর ক'রে সাজিয়ে পেশ করে এবং নিদ্রিত আশা-আকাঙ্ক্ষাকে এমনভাবে জাগিয়ে তোলে যে, মানুষ তার জন্য বিশাল পরিমাণ অর্থ অনায়াসে ব্যয় করে ফেলে। তাইতো দেখা যায় যে, যখন কোন মসজিদ, মাদ্রাসা অথবা কল্যাণকর কাজের জন্য কেউ চাঁদার জন্য যায়, তখন বিত্তশালী টাকা-পয়সার মালিক এক-দু'শ টাকা দেওয়ার জন্য বার বার হিসাবের খাতা যাচাই করে এবং চাঁদা আদায়কারীদেরকে অনেক সময় বহুবার আনাগোনা করতে বাধ্য করা হয়। পক্ষান্তরে এই মানুষটাই সিনেমা, টিভি, মদপান, প্রেম-ব্যভিচার এবং মামলা-মকদ্দমার জালে ফেঁসে গিয়ে বেহিসাব মাল ব্যয় করে। এ সব কাজে অর্থ ব্যয় করার সময় তার মধ্যে কোন প্রকারের উৎকণ্ঠা ও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব প্রকাশ পায় না!

([২১]) حِكْمَة 'হিকমত'এর অর্থ কেউ করেছেন, জ্ঞান-বুদ্ধি-প্রজ্ঞা। কেউ করেছেন, সঠিক মত বা সিদ্ধান্ত, কুরআনের 'নাসেখ-মানসুখ'এর জ্ঞান এবং বিচার শক্তি। আবার কারো নিকট 'হিকমত' হল, কেবল সুন্নাতের জ্ঞান অথবা কিতাব ও সুন্নাতের জ্ঞান। অথবা উপরোক্ত সব অর্থই 'হিকমত'-এর আওতাভুক্ত। সহীহ বুখারী ও মুসলিম ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, "দুই ব্যক্তির প্রতি ঈর্ষা করা বৈধ। এক ব্যক্তি হল সেই, যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন এবং সে তা সৎপথে ব্যয় করে। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি হল সে, যাকে আল্লাহ হিকমত দান করেছেন যার দ্বারা সে বিচার-ফয়সালা করে এবং মানুষদেরকেও তা শিক্ষা দেয়।" *(বুখারী, অধ্যায়ঃ ইল্‌ম, মুসলিম, অধ্যায়ঃ সালাতুল মুসাফেরীন)*

خَيْراً كَثِيراً وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُوا الأَلْبَابِ (٢٦٩)

প্রদান করা হয়, তাকে নিশ্চয় প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়। বস্তুতঃ শুধু জ্ঞানীরাই উপদেশ গ্রহণ ক'রে থাকে।

وَمَا أَنفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ (٢٧٠)

(২৭০) যা তোমরা দান কর অথবা যা কিছু তোমরা নযর-মানত কর,[২২] আল্লাহ তা অবশ্যই জানেন এবং অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই।

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٢٧١)

(২৭১) তোমরা যদি প্রকাশ্যে দান কর, তবে তা উত্তম। আর যদি তা গোপনে কর এবং অভাবগ্রস্তকে দাও, তবে তা তোমাদের জন্য আরও উত্তম।[২৩] এতে তিনি তোমাদের কিছু কিছু পাপ মোচন করবেন, বস্তুতঃ তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্বন্ধে অবহিত।

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلاَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ (٢٧٢)

(২৭২) তাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করার দায়-দায়িত্ব তোমার নয়, বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন। আর তোমরা যা কিছু ধন-সম্পদ দান কর, তা নিজেদের উপকারের জন্যই। আল্লাহর মুখমণ্ডল (দর্শন বা সন্তুষ্টি) ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে তোমরা দান করো না। আর তোমরা যা দান কর, তার পুরস্কার পূর্ণভাবে প্রদান করা হবে[২৪] এবং তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না।

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنْ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافاً وَمَا تُنفِقُوا

(২৭৩) (দান) অভাবগ্রস্ত লোকদের প্রাপ্য; যারা আল্লাহর পথে এমনভাবে ব্যাপৃত যে, জীবিকার সন্ধানে ভূপৃষ্ঠে ঘোরা-ফেরা করতে পারে না।[২৫] তারা কিছু চায় না বলে, অবিবেচক লোকেরা তাদেরকে অভাবমুক্ত মনে করে। তুমি তাদেরকে তাদের লক্ষণ দেখে চিনতে পারবে; তারা লোকেদের কাছে নাছোড়বান্দা হয়ে যাচ্ঞা করে না।[২৬] আর তোমরা যা কিছু ধন-সম্পদ দান কর,

---

(২২) نذر 'নযর' তথা মানত করা বলতে এই নিয়ত করা যে, আমার অমুক কাজটা যদি হয়ে যায় অথবা অমুক বিপদ থেকে যদি আমি মুক্তি পাই, তাহলে আল্লাহর রাস্তায় এতটা পরিমাণ আমি সাদক্বা করব। এই মানত পূরণ করা জরুরী। তবে কোন অবাধ্যতা অথবা অবৈধ কাজের মানত করে থাকলে তা পূরণ করা বৈধ নয়। মানত করাও নামায-রোযার মত একটি ইবাদত। কাজেই আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে মানত করলে সেটা তারই ইবাদত বলে গণ্য হবে, আর তা হবে শির্ক। যেমন বর্তমানে অনেক প্রসিদ্ধ কবরসমূহে গিয়ে মানত ক'রে সেখানে ব্যাপকহারে নযরানা পেশ করা হয়। মহান আল্লাহ এই ধরনের শির্ক থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন। আমীন।

(২৩) এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সাধারণ অবস্থায় গোপনে সাদক্বা করাই উত্তম। তবে সাদক্বা করার প্রতি মানুষকে উৎসাহ দানের প্রতি লক্ষ্য করে প্রকাশ্যেও তা করা যায়। আর এ ক্ষেত্রে যে সর্বাগ্রে অগ্রসর হবে তার যদি লোক দেখানো উদ্দেশ্য না হয়, তাহলে সে যে বিশেষ ফযীলত লাভ করবে সে কথাও বহু হাদীস দ্বারা পরিষ্কারভাবে জানা যায়। এই ধরনের কিছু বিশেষ পরিস্থিতি ছাড়া অন্যান্য অবস্থায় চুপিসারে সাদক্বা-খয়রাত করাই শ্রেয়। নবী করীম ﷺ বলেছেন, যারা কিয়ামতের দিন আল্লাহর আরশের ছায়া লাভ করবে, তাদের মধ্যে এক শ্রেণীর লোক হবে তারা, যারা এমন গোপনীয়তা রক্ষা করে দান করেছে যে, তাদের ডান হাত কি ব্যয় করেছে, তা বাম হাতও জানতে পারেনি। কোন কোন আলেমের নিকট গোপনে সাদক্বা করার যে ফযীলত তা কেবল নফল সাদক্বার মধ্যে সীমিত। তাঁদের মতে যাকাত আদায় প্রকাশ্যে করাই উত্তম। কিন্তু কুরআনের ব্যাপক নির্দেশ নফল ও ফরয উভয় সাদক্বাকেই শামিল করে। *(ইবনে কাসীর)* অনুরূপ হাদীসের ব্যাপকার্থবোধক শব্দও এ কথার সমর্থন করে।

(২৪) তফসীরের বর্ণনায় এই আয়াতের শা'নে নুযূল সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, মুসলিমরা তাদের মুশরিক আত্মীয়-স্বজনদেরকে সাহায্য করা বৈধ মনে করত না এবং তারা চাইত যে, এরা (মুশরিকরা) মুসলিম হয়ে যাক। তাই মহান আল্লাহ বললেন, হিদায়াতের পথে নিয়ে আসা তো কেবলমাত্র আল্লাহর এখতিয়ারাধীন। আর দ্বিতীয় কথা বলা হল যে, তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যা কিছু ব্যয় করবে, তার পুরাপুরি প্রতিদান তোমরা পাবে। এ থেকে জানা গেল যে, দান করে অমুসলিম আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখাতেও নেকী পাওয়া যায়। তবে যাকাত কেবলমাত্র মুসলিমদের অধিকার, তা কোন অমুসলিমকে দেওয়া যেতে পারে না।

(২৫) এ থেকে সেই মুহাজিরদের বুঝানো হয়েছে যাঁরা মক্কা ত্যাগ ক'রে আসেন এবং আল্লাহর পথে এসে প্রত্যেক জিনিস থেকে বঞ্চিত হতে হয়। সব কিছুই তাঁদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়। দ্বীনী জ্ঞান অন্বেষণকারী ছাত্র-ছাত্রী এবং আলেমরাও এরই আওতায় পড়তে পারে।

(২৬) অর্থাৎ, ঈমানদারদের গুণ হল, অভাব-অনটন সত্ত্বেও তারা চাওয়া ও ভিক্ষা করা থেকে বাঁচতে চেষ্টা করে এবং নাছোড় বান্দা হয়ে চাওয়া থেকে বিরত থাকে। কেউ কেউ إلحاف এর অর্থ করেছেন, মোটেই না চাওয়া। কেননা, তাদের প্রথম গুণ বলা হয়েছে যে, তারা যাচ্ঞা করে না। *(ফাতহুল ক্বাদীর)* আর কেউ কেউ বলেছেন, তারা চাওয়াতে বারবার আবেদন ও কাকুতি-

مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ (٢٧٣)

আল্লাহ তা সবিশেষ জ্ঞাত।

الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرّاً وَعَلانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (٢٧٤)

(২৭৪) যে সকল লোক দিবারাত্রে গোপনে ও প্রকাশ্যে তাদের ধন দান করে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে পুরস্কার রয়েছে। সুতরাং তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না।

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ

(২৭৫) যারা সূদ[২৭] খায়, তারা (কিয়ামতে) সেই ব্যক্তির মত দন্ডায়মান হবে, যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল ক'রে দিয়েছে।[২৮] তা এ জন্য যে, তারা বলে, 'ব্যবসা তো সূদের মতই।'[২৯] অথচ

মিনতি করে না এবং অপ্রয়োজনীয় জিনিস লোকের কাছে প্রার্থনা করে না। কারণ, إلحـــاف হল, প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও (স্বভাবগত কারণে) মানুষের কাছে চাওয়া। এই অর্থের সমর্থন সেই হাদীসসমূহ দ্বারাও হয়ে যায় যাতে বলা হয়েছে, "মিসকীন তো সে নয়, যে একটি-দু'টি খেজুরের জন্য অথবা এক-দু' লুকমা খাবারের জন্য দ্বারে দ্বারে গিয়ে চেয়ে বেড়ায়, বরং আসল মিসকীন তো সেই, যে (অভাব সত্ত্বেও) চাওয়া থেকে বেঁচে থাকে।" অতঃপর নবী করীম ﷺ প্রমাণস্বরূপ [لاَ يَسْئَلُوْنَ النَّاسَ إِلْحَافًا] আয়াতটি পাঠ করেন। *(সহীহ বুখারী ১৪৭৬নং)* এই জন্য পেশাদার ভিক্ষুকের পরিবর্তে মুহাজির, দ্বীনী জ্ঞান অন্বেষণকারী ছাত্র-ছাত্রী, উলামা এবং চাইতে পারে না অথবা চাইতে লজ্জাবোধ করে এমন গুপ্ত অভাবীদের খোঁজ ক'রে তাদের সহযোগিতা করা উচিত। কারণ, অন্যের সামনে হাতপাতা মানুষের আত্মসম্মান পরিপন্থী ও মর্যাদাহানিকর কর্ম। তাছাড়া হাদীসে এসেছে যে, যার কাছে তার প্রয়োজনের যথেষ্ট সামগ্রী থাকা সত্ত্বেও মানুষের কাছে ভিক্ষা চায়, কিয়ামতের দিন তার মুখমন্ডল ক্ষত-বিক্ষত হবে। *(সুনানে আরবাআহ)* আর বুখারী ও মুসলিম শরীফের বর্ণনায় এসেছে যে, "যে ব্যক্তি সব সময় মানুষের কাছে চায়, কিয়ামতের দিন তার মুখমন্ডলে গোশ্ত থাকবে না।" *(বুখারী ১৪৭৫, মুসলিম ১০৪০নং)*

(২৭) الربا (সূদ)এর আভিধানিক অর্থ হল, বাড়তি এবং বৃদ্ধি। শরীয়তে সূদ দুই প্রকার; 'রিবাল ফাযল' এবং 'রিবান নাসীয়াহ'। 'রিবাল ফাযল' সেই সূদকে বলা হয় যা ছয়টি জিনিসের বিনিময়কালে কমবেশী অথবা নগদ ও ধারের কারণে হয়ে থাকে। (যার বিশদ বর্ণনা হাদীসে আছে।) যেমন, গমের পরিবর্তন যদি গম দ্বারা করা হয়, তাহলে প্রথমতঃ তা সমান সমান হতে হবে এবং দ্বিতীয়তঃ তা নগদ-নগদ হতে হবে। এতে যদি কমবেশী হয় তাও এবং নগদ নগদ না হয়ে যদি একটি নগদ এবং অপরটি ধারে হয় অথবা দু'টিই যদি ধারে হয় তবুও তা সূদ হবে। আর 'রিবান নাসীয়াহ' হল, কাউকে ছয় মাসের জন্য এই শর্তের ভিত্তিতে ১০০ টাকা দেওয়া যে, পরিশোধ করার সময় ১২৫ টাকা দিতে হবে। ছয় মাস পর নেওয়ার কারণে ২৫ টাকা বাড়তি নেওয়া। আলী ﷺ-এর এ সম্পর্কিত একটি উক্তিতে এটাকে ঠিক এইভাবে বলা হয়েছে, ((كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا)) "যে ঋণ কোন মুনাফা টেনে আনে, তা-ই সূদ।" *(ফাইযুল ক্বাদীর শারহুল জামেইস্ সাগীর ৫/২৮)* এই ধার ব্যক্তিগত প্রয়োজনের জন্য নেওয়া হোক অথবা ব্যবসার জন্য উভয় প্রকার ধারের উপর নেওয়া সূদ হারাম। জাহেলিয়াতের যুগে এই ধারের প্রচলন ছিল। শরীয়ত উভয় প্রকারের ধারের মধ্যে কোন পার্থক্য না ক'রে দু'টোকেই হারাম করে দিয়েছে। সুতরাং যারা বলে, ব্যবসার জন্য যে ঋণ (যা সাধারণতঃ ব্যাংক থেকে) নেওয়া হয়, তাতে যে বাড়তি অর্থ পরিশোধ করতে হয়, তা সূদ নয়। কারণ ঋণগ্রহীতা তা থেকে উপকৃত হয় এবং সে তার (লাভের) কিয়দংশ ব্যাংক অথবা ঋণদাতাকে ফিরিয়ে দেয়। অতএব এতে দোষের কি আছে? এতে কি দোষ আছে তা এমন আধুনিক শিক্ষিত মানুষের নজরে পড়বে না, যারা এটাকে বৈধ সাব্যস্ত করতে চায়। তবে মহান আল্লাহর দৃষ্টিতে তাতে বহু দোষ বিদ্যমান রয়েছে। যেমন, ঋণ নিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যকারীর লাভ যে হবেই তার কোন নিশ্চয়তা নেই। বরং লাভ তো দূরের কথা মূল পুঁজি অবশিষ্ট থাকবে কি না তারও কোন ভরসা নেই। কখনো কখনো ব্যবসায় সমস্ত টাকা-পয়সা ডুবে যায়। পক্ষান্তরে ঋণদাতা (ব্যাংক হোক অথবা সূদের উপর টাকা-পয়সা দেয় এমন যেই হোক না কেন তার) লাভ একেবারে সুনিশ্চিত, তার লভ্যাংশ যে কোন অবস্থায় আদায় করতেই হবে। এটা হল যুলুমের একটি প্রকাশ্য চিত্র। ইসলামী শরীয়ত এটাকে কিভাবে বৈধ সাব্যস্ত করতে পারে? শরীয়ত তো ঈমানদারদেরকে সমাজের অভাবীদের উপর পার্থিব কোন লাভ ও উদ্দেশ্য ছাড়াই ব্যয় করার প্রতি উৎসাহ দান করেছে। যাতে সমাজে ভ্রাতৃত্ব, সহানুভূতি, সহযোগিতা এবং দয়া-দাক্ষিণ্য ও প্রেম-প্রীতির উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। পক্ষান্তরে সূদী কারবারের ফলে হার্দিক কঠোরতা এবং স্বার্থপরতার সৃষ্টি হয়। একজন পুঁজিপতির কেবল মুনাফাই উদ্দেশ্য হয়; চাহে সমাজে অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিরা রোগ, ক্ষুধা ও কপর্দকশূন্যতার জ্বালায় কাতরাতে থাকে এবং বেকার ও কর্মহীনরা নিজেদের জীবন থেকে নিরাশ হয়ে যায়। এই বর্বরতা ও নির্দয়তাকে শরীয়ত কিভাবে পছন্দ করতে পারে? এর আরো অনেক অপকারিতার দিক আছে। এখানে বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়। মোট কথা সূদ হারাম; তাতে তা ব্যক্তিগত প্রয়োজনের জন্য নেওয়া ঋণের সূদ হোক অথবা ব্যবসার জন্য নেওয়া ঋণের সূদ।

(২৮) সূদখোরের এই অবস্থা কবর থেকে উঠার সময় হবে অথবা হাশর প্রান্তরে হবে। (এখান থেকে জ্বিন পাওয়ার কথা প্রমাণ হয়।)

(২৯) অথচ ব্যবসায় নগদ টাকা এবং কোন জিনিসের মাঝে বিনিময় হয়ে থাকে। তাছাড়া এতে লাভ-নোকসান উভয়েরই সম্ভাবনা থাকে। পক্ষান্তরে সূদে উক্ত দু'টির কোনটাই থাকে না। এ ছাড়া ব্যবসাকে মহান আল্লাহ বৈধ করেছেন এবং সূদকে করেছেন হারাম। সুতরাং এ দু'টো কি ক'রে একই হতে পারে?

مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ(٢٧٥)

আল্লাহ ব্যবসাকে বৈধ ও সূদকে অবৈধ করেছেন। অতএব যার কাছে তার প্রতিপালকের উপদেশ এসেছে, তারপর সে (সূদ খাওয়া থেকে) বিরত হয়েছে, সুতরাং (নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বে) যা অতীত হয়েছে তা তার (জন্য ক্ষমার্হ হবে),[৩০] আর তার ব্যাপার আল্লাহর এখতিয়ারভুক্ত।[৩১] কিন্তু যারা পুনরায় (সূদ খেতে) আরম্ভ করবে, তারাই দোযখবাসী; সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (٢٧٦)

(২৭৬) আল্লাহ সূদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বৃদ্ধি দেন।[৩২] আল্লাহ কোন অকৃতজ্ঞ পাপীকে ভালবাসেন না।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (٢٧٧)

(২৭৭।) যারা বিশ্বাস করে এবং সৎকার্য করে, নামায যথাযথভাবে আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে, তাদের পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের নিকট আছে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখও পাবে না।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨)

(২৭৮) হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সূদের যা বকেয়া আছে তা বর্জন কর; যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ(٢٧٩)

(২৭৯) আর যদি তোমরা (সূদ বর্জন) না কর, তাহলে আল্লাহ ও তার রসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধ সুনিশ্চিত জানো।[৩৩] কিন্তু যদি তোমরা তওবা কর, তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই। তোমরা কারো উপর অত্যাচার করবে না এবং নিজেরাও অত্যাচারিত হবে না।[৩৪]

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٨٠)

(২৮০) যদি (খাতক) অভাবী হয়, তাহলে তাকে সচ্ছল হওয়া পর্যন্ত অবকাশ দাও। আর যদি ঋণ মাফ করে দাও, তাহলে তা তোমাদের জন্য আরও উত্তম;[৩৫] যদি তোমরা উপলব্ধি কর।

وَاتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا

(২৮১) আর তোমরা ভয় কর সেই দিনকে, যেদিনে তোমাদেরকে আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে। অতঃপর প্রত্যেককে তার কর্মের ফল পূর্ণভাবে প্রদান করা হবে, আর তাদের প্রতি কোনরূপ অন্যায়

---

(৩০) অর্থাৎ, ঈমান আনা অথবা তওবা করার পর বিগত সূদের উপর পাকড়াও হবে না।

(৩১) তিনি তাকে তওবার উপর সুদৃঢ় রাখবেন, অথবা বদ-আমল ও নিয়তের খারাবীর কারণে তাকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিবেন। এই জন্যই পুনরায় সূদ গ্রহণকারীদের উপর কঠোর ধমক এসেছে।

(৩২) এটা হল সূদের অভ্যন্তরীণ ও আধ্যাত্মিক ক্ষতিসমূহ এবং সাদক্বার বরকতসমূহের বিবরণ। সূদ বাহ্যিকভাবে দেখতে বৃদ্ধিশীল লাগলেও অভ্যন্তরীণভাবে অথবা পরিণামের দিক দিয়ে সূদের অর্থ ধ্বংস ও বিনাশেরই হয়। আর এ কথা যে অতি বাস্তব তা ইউরোপের অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরাও স্বীকার করেছেন।

(৩৩) এটা এমন এক কঠোর ধমক যে, এ রকম ধমক অন্য কোন পাপের উপর আসেনি। এই জন্য আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, ইসলামী দেশে যে ব্যক্তি সূদ ছাড়তে প্রস্তুত হবে না, দেশের শাসকের দায়িত্ব হবে তাকে তওবা করানো এবং (সূদ খাওয়া থেকে) বিরত না হলে তার শিরশ্ছেদ করা। *(ইবনে কাসীর)*

(৩৪) যদি তুমি তোমার মূলধন থেকে বেশী নাও, তাহলে এটা তোমার পক্ষ থেকে অত্যাচার হবে। আর যদি তোমাকে তোমার মূলধনও ফিরিয়ে না দেওয়া হয়, তাহলে এটা তোমার উপরে অত্যাচার করা হবে।

(৩৫) ইসলামের পূর্বে জাহেলী যুগে ঋণ পরিশোধ না হলে চক্রবৃদ্ধিহারে সূদের উপর সূদ বাড়তে বাড়তে মূলধনে যোগ হত। ফলে সামান্য অর্থ একটি পাহাড় হয়ে দাঁড়াত এবং তা পরিশোধ করা অসম্ভব হয়ে পড়ত। মহান আল্লাহ এর বিপরীত নির্দেশ দিয়ে বললেন, যদি ঋণগ্রহীতা অভাবগ্রস্ত হয়, তাহলে (সূদ নেওয়া তো দূরের কথা মূলধন নেওয়ার ব্যাপারেও) সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত তাকে সময় দাও। আর যদি ঋণ একেবারে মাফ ক'রে দাও, তাহলে তা আরো উত্তম। হাদীসসমূহেও এর বড়ই ফযীলতের কথা বর্ণিত হয়েছে। উভয় নীতির মধ্যে কত ব্যবধান? একটি একেবারে যুলুম, নির্দয়তা এবং স্বার্থপরতার উপর প্রতিষ্ঠিত। আর দ্বিতীয়টি সহানুভূতি, সহযোগিতা এবং একে অপরকে সাহায্য করার নীতি। মুসলিমরা যদি বর্কতময় এবং দয়াভরা আল্লাহর এই নীতিকে গ্রহণ না করে, তাহলে তাতে ইসলামের দোষ কি এবং আল্লাহর প্রতি দোষারোপ কেন? হায়! মুসলিমরা যদি তাদের দ্বীনের গুরুত্ব ও উপকারিতার কথা বুঝত এবং সেই অনুযায়ী যদি নিজেদের জীবন পরিচালনা করতে পারত (তাহলে কতই না ভালো হত)!

করা হবে না।[৩৬]

كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (٢٨١)

(২৮২) হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য পরস্পর ঋণ দেওয়া-নেওয়া কর, তখন তা লিখে নাও।[৩৭] আর তোমাদের মধ্যে কোন লেখক যেন ন্যায়ভাবে তা লিখে দেয় এবং আল্লাহ যেরূপ শিক্ষা দিয়েছেন --সেইরূপ লিখতে কোন লেখক যেন অস্বীকার না করে। অতএব তার লিখে দেওয়াই উচিত। আর ঋণগ্রহীতা যেন লেখার বিষয় বলে দিয়ে লিখিয়ে নেয়[৩৮] এবং সে যেন স্বীয় প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করে এবং লেখার মধ্যে বিন্দুমাত্র কম-বেশী না করে। অনন্তর ঋণগ্রহীতা যদি নির্বোধ হয় কিংবা দুর্বল হয় অথবা নিজে লেখার বিষয়বস্তু বলে দিতে অক্ষম হয়, তাহলে তার অভিভাবক যেন ন্যায়সঙ্গতভাবে তা লেখায়। আর তোমাদের মধ্যে দু'জন পুরুষকে (এই আদান-প্রদানের) সাক্ষী কর। যদি দু'জন পুরুষ না পাও, তাহলে সাক্ষীদের মধ্যে যাদেরকে তোমরা পছন্দ কর তাদের মধ্য হতে একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলাকে সাক্ষী কর; [৩৯] যাতে মহিলাদ্বয়ের একজন ভুলে গেলে যেন অন্য জন তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়।[৪০] আর যখন (সাক্ষ্য দিতে) ডাকা হয়, তখন যেন সাক্ষীরা অস্বীকার না করে। (ঋণ) ছোট হোক, বড় হোক, তোমরা মেয়াদসহ লিখতে কোনরূপ অলসতা করো না। এ লেখা আল্লাহর নিকট ন্যায্যতর ও সাক্ষ্য (প্রমাণের) জন্য দৃঢ়তর এবং তোমাদের মধ্যে সন্দেহ উদ্রেক না হওয়ার অধিক নিকটতর।[৪১] কিন্তু তোমরা পরস্পরে ব্যবসায় যে নগদ আদান-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُوا إِلاَّ

---

(৩৬) কোন কোন আষারে (সাহাবীর উক্তিতে) এসেছে যে, এটা হল কুরআন কারীমের সর্বশেষ আয়াত। নবী করীম ﷺ-এর উপর সবশেষে এই আয়াত নাযিল হওয়ার কিছু দিন পর তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। *(ইবনে কাসীর)*

(৩৭) যে সমাজে সূদী কার্যকলাপকে কঠোরভাবে নিষেধ ক'রে সাদক্বা-খয়রাত করার প্রতি তাকীদ করা হয়েছে, সেই সমাজে ঋণ করার প্রয়োজন পড়ে বেশী। কারণ সূদ তো হারাম এবং সব মানুষ সাদক্বা-খয়রাত করার সামর্থ্য রাখে না। তাছাড়া সব লোক সাদক্বা নিতে পছন্দও করে না। সুতরাং স্বীয় প্রয়োজন পূরণ করার জন্য উপায় এখন ঋণ আদান-প্রদান করা। আর এই কারণেই ঋণ দেওয়া যে বড় ফযীলতের কাজ, সে কথা বহু হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তবে ঋণ যেহেতু অতীব প্রয়োজনীয় জিনিস, তাই এর প্রতি গুরুত্ব না দিলে অথবা এ ব্যাপারে অলসতা করলে, তা কলহ-বিবাদের কারণও হতে পারে। তাই এই আয়াতে --যাকে 'আয়াতুদ দাইন' বলা হয় এবং যেটা কুরআনের মধ্যে সব থেকে লম্বা আয়াত -তাতে মহান আল্লাহ ঋণের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দান করেছেন। যাতে এই গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনটি কলহ-বিবাদের কারণ না হয়ে দাঁড়ায়। কাজেই এ ব্যাপারে একটি নির্দেশ হল, মেয়াদ নির্দিষ্ট ক'রে নাও। দ্বিতীয় নির্দেশ, এটা লিখে নাও এবং তৃতীয় নির্দেশ হল, এর উপর দু'জন মুসলিম পুরুষকে অথবা একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলাকে সাক্ষী বানিয়ে নাও।

(৩৮) এ থেকে ঋণগ্রহীতাকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, সে যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং টাকার যেন সঠিক পরিমাণ লিখায়, কম ক'রে যেন না লিখায়। এর পর বলা হচ্ছে, ঋণগ্রহীতা যদি নির্বোধ অথবা দুর্বল শিশু কিংবা পাগল হয়, তাহলে তার অভিভাবকের উচিত ইনসাফের সাথে লিখিয়ে নেওয়া, যাতে ঋণদাতার কোন ক্ষতি না হয়।

(৩৯) অর্থাৎ, যাদের দ্বীনদারী ও ন্যায়-নিষ্ঠার ব্যাপারে তোমরা পূর্ণ আস্থাবান। কুরআনের এই আয়াত দ্বারা এ কথাও জানা গেল যে, দু'জন মহিলার সাক্ষি একজন পুরুষের সমান। অনুরূপ পুরুষ ছাড়াই কেবল একজন মহিলার সাক্ষি জায়েয নয়; কেবল সেই ব্যাপারগুলো ছাড়া যে ব্যাপার মহিলা ব্যতীত অন্য কারো জানা সম্ভব নয়। তবে বাদীর (অভিযোক্তার) একটি কসমের সাথে দু'জন মহিলার সাক্ষির ভিত্তিতে ফয়সালা করা জায়েয না নাজায়েয, এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। যেমন, একজন পুরুষ সাক্ষি দিলে এবং দ্বিতীয় সাক্ষীর পরিবর্তে বাদী কসম খেলে ফায়সালা করা জায়েয। হানাফী ফক্বীহদের নিকট এ রকম করা জায়েয নয়। তবে মুহাদ্দিসীনগণ জায়েয হওয়ার কথাই ব্যক্ত করেছেন। কারণ, হাদীসে একজন সাক্ষী এবং কসমের সাথে ফায়সালা করা প্রমাণিত। আর দু'জন মহিলা যখন একজন পুরুষ সাক্ষীর সমান, তখন দু'জন মহিলা এবং কসমের সাথে ফায়সালা করা অবশ্যই জায়েয হবে। *(ফাতহুল ক্বাদীর)*

(৪০) এখানে একজন পুরুষের মোকাবেলায় দু'জন মহিলার সমান হওয়ার কারণ ও যুক্তি আছে। অর্থাৎ, মহিলা জ্ঞান ও স্মরণশক্তিতে পুরুষের থেকে দুর্বল। (যেমন মুসলিম শরীফের হাদীসে মহিলাকে কম জ্ঞানের অধিকারিণী বলা হয়েছে।) এখানে মহিলাকে ছোট ও তুচ্ছ সাব্যস্ত করা উদ্দেশ্য নয়। (যেমন, অনেকে বুঝাতে চেষ্টা করে।) বরং উদ্দেশ্য হল, একটি প্রাকৃতিক দুর্বলতার কথা বর্ণনা করা; যা মহান আল্লাহর ইচ্ছা এবং তাঁর কৌশলগত ব্যাপারের অন্তর্ভুক্ত। অহংকারবশতঃ কেউ যদি তা স্বীকার না করে, তাহলে তার ব্যাপার ভিন্ন। তবে প্রকৃতার্থে এবং বাস্তবতার দিক দিয়ে এটা অস্বীকারযোগ্য নয়।

(৪১) এটা ঋণ আদান-প্রদানের কথা লিখে রাখার উপকারিতা। এ থেকে সুবিচারের দাবীসমূহ পূরণ হবে, সাক্ষিও ঠিক থাকবে

أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٨٢)

প্রদান কর, তা না লিখলে কোন দোষ নেই। তোমরা যখন পরস্পর বেচা-কেনা কর, তখন সাক্ষী রাখ।[৪২] আর কোন লেখক যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় এবং না কোন সাক্ষী।[৪৩] যদি তোমরা তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত কর, তাহলে তা হবে তোমাদের পক্ষে পাপের বিষয়। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর।[৪৪] আল্লাহ তোমাদেরকে শিক্ষা দেন। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে মহাজ্ঞানী।

وَإِنْ كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِباً فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٢٨٣)

(২৮৩) আর যদি তোমরা সফরে থাক এবং কোন লেখক না পাও, তাহলে বন্ধকী হাতে রাখা বিধেয়।[৪৫] আর যদি তোমরা পরস্পর পরস্পরকে বিশ্বাস কর, তাহলে যাকে বিশ্বাস করা হয়, সে যেন (বিশ্বাস বজায় রেখে) আমানত প্রত্যর্পণ করে এবং তার প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করে।[৪৬] আর তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না, বস্তুতঃ যে তা গোপন করে, নিশ্চয় তার অন্তর পাপময়।[৪৭] তোমরা যা কর, আল্লাহ তা সবিশেষ অবহিত।

لله مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ

(২৮৪) আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই আল্লাহর। বস্তুতঃ তোমাদের মনে যা আছে তা প্রকাশ কর অথবা গোপন রাখ, আল্লাহ তার হিসাব তোমাদের নিকট থেকে গ্রহণ করবেন।[৪৮] অতঃপর যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করবেন এবং যাকে

(সাক্ষীর মৃত্যুর পর এবং তার অনুপস্থিত থাকাকালীন এই লেখা কাজে আসবে।) এবং সন্দেহ-সংশয় থেকে উভয় পক্ষ হিফাযতে থাকবে। কারণ, সন্দেহের সৃষ্টি হলে লেখা দেখে তা দূর করে নেওয়া যেতে পারে।

(৪২) এটা এমন বেচা-কেনা যা ধারে হয় অথবা দাম-দর হয়ে যাওয়ার পরও যাতে ফিরে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। নচেৎ ইতিপূর্বে নগদ বেচা-কেনার কথা লিখে নেওয়ার নির্দেশ থেকে পৃথক করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, এই বেচা-কেনা থেকে উদ্দেশ্য হল, জমি-জায়গা, বাড়ি-দোকান, বাগান ও পশু বেচা-কেনা। *(আয়সারুত তাফাসীর)*

(৪৩) তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হল, কোন দূর-দূরান্ত অঞ্চলে তাদেরকে ডেকে আনা; যার কারণে তাদের নিজেদের কাজকর্মে ব্যাঘাত ঘটে অথবা ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। (তাদেরকে রাহাখরচ না দেওয়া) কিংবা তাদেরকে মিথ্যা কথা লিখতে এবং মিথ্যা সাক্ষি দিতে বাধ্য করা ইত্যাদি।

(৪৪) অর্থাৎ, যে বিষয়গুলোর প্রতি তাকীদ করা হয়েছে, সেগুলোর উপর আমল কর এবং যে সব জিনিস থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে, তা থেকে বিরত থাকো।

(৪৫) যদি সফরে ঋণ লেনদেনের প্রয়োজন পড়ে এবং সেখানে লেখার লোক অথবা কাগজ-কলম ইত্যাদি না থাকে, তাহলে তার বিকল্প ব্যবস্থা হল, ঋণগ্রহীতা কোন জিনিস ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখবে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, বন্ধক রাখা শরীয়ত সম্মত একটি বৈধ জিনিস। নবী করীম ﷺও তাঁর লোহার বর্মটি একজন ইয়াহুদীর কাছে বন্ধক রেখেছিলেন। *(বুখারী ২২০০নং, মুসলিম)* এই বন্ধক রাখা জিনিসটি যদি এমন হয় যার দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়, তাহলে তার উপকারিতার অধিকারী হবে মালিক; ঋণদাতা নয়। অবশ্য বন্ধকে রাখা জিনিসে যদি ঋণদাতার কোন কিছু ব্যয় হয়, তবে সে তার খরচ নিতে পারবে। খরচ নিয়ে নেওয়ার পর অবশিষ্ট লাভ মালিককে দেওয়া জরুরী হবে।

(৪৬) অর্থাৎ, তোমাদের একে অপরের প্রতি যদি বিশ্বাস থাকে, তাহলে কিছু বন্ধক রাখা ছাড়াই ঋণের আদান-প্রদান করতে পার। (এখানে 'আমানত' অর্থ ঋণ।) আল্লাহকে ভয় ক'রে তা (আমানত) সঠিকভাবে আদায় কর।

(৪৭) সাক্ষ্য গোপন করা কাবীরা গুনাহ। এই জন্যই এর কঠোর শাস্তির কথা কুরআনের এই আয়াতে এবং বহু হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে। অনুরূপ সত্য সাক্ষ্য দেওয়ার ফযীলতও অনেক। এক হাদীসে নবী করীম ﷺ বলেছেন, "আমি কি তোমাদেরকে উত্তম সাক্ষিদাতার কথা বলে দিবো না? সে হল এমন লোক, যার কাছে সাক্ষি তলব করার পূর্বেই সে নিজেই সাক্ষি নিয়ে উপস্থিত হয়ে যায়।" *(মুসলিম ১৭১৯নং)* অপর এক বর্ণনায় নিকৃষ্টতম সাক্ষিদাতার কথা বলতে গিয়ে বলেন, "আমি কি তোমাদেরকে নিকৃষ্টতম সাক্ষিদাতাদের কথা বলে দিবো না? তারা এমন লোক, যাদের নিকট সাক্ষি চাওয়ার পূর্বেই তারা সাক্ষি দেয়।" *(মুসলিম ২৫৩৫নং)* অর্থাৎ, এরা মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে মহাপাপ সম্পাদন করে। আলোচ্য আয়াতে বিশেষ ক'রে অন্তরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, গোপন করা অন্তরের কাজ। তাছাড়া অন্তর হল অন্য সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নেতা। এটা গোশ্তের এমন এক টুকরা যে, যদি এটা ঠিক থাকে, তাহলে সারা দেহ ঠিক থাকবে। আর যদি এর মধ্যে খারাবী আসে, তাহলে সমস্ত দেহ খারাবীর শিকার হয়ে পড়বে। ((أَلاَ وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ أَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ)) ((অর্থাৎ, শোন! শরীরে এমন একটি গোশ্তের টুকরা আছে যে, যদি তা ঠিক থাকে, তাহলে সারা দেহ ঠিক থাকবে। আর যদি তা নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে সারা দেহ নষ্ট হয়ে যাবে। শোন! তা হল, অন্তর।" *(বুখারী ৫২নং)*

(৪৮) হাদীসসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন এই আয়াত নাযিল হয়, তখন সাহাবায়ে কেরাম বড়ই বিচলিত হয়ে পড়েন। তাঁরা রসূল ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজি পেশ ক'রে বলেন, হে আল্লাহর রসূল! নামায-রোযা এবং যাকাত ও জিহাদ

وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٢٨٤)

খুশী শাস্তি দেবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (٢٨٥)

(২৮৫) রসূল তার প্রতি তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতে সে বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং বিশ্বাসিগণও; সকলে আল্লাহতে, তাঁর ফিরিশ্তাগণে, তাঁর কিতাবসমূহে এবং তাঁর রসূলগণে বিশ্বাস স্থাপন করেছে। (তারা বলে,) আমরা তাঁর রসূলগণের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না।[৪৯] আর তারা বলে, আমরা শুনলাম ও মান্য করলাম! হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমার ক্ষমা চাই, আর তোমারই দিকে (আমাদের) প্রত্যাবর্তন হবে।

لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ(٢٨٦)

(২৮৬) আল্লাহ কাউকেও তার সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব অর্পণ করেন না। যে ভাল উপার্জন করবে সে তার (প্রতিদান পাবে) এবং যে মন্দ উপার্জন করবে সে তার (প্রতিফল পাবে)। হে আমাদের প্রতিপালক! যদি আমরা বিস্মৃত হই অথবা ভুল করি তাহলে তুমি আমাদেরকে অপরাধী করো না। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পূর্ববর্তিগণের উপর যেমন গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছিলে আমাদের উপর তেমন দায়িত্ব অর্পণ করো না। হে আমাদের প্রতিপালক! এমন ভার আমাদের উপর অর্পণ করো না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর, আমাদের পাপ মোচন কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমি আমাদের অভিভাবক। অতএব সত্য প্রত্যাখ্যানকারী (কাফের) সম্প্রদায়ের

ইত্যাদি যে সমস্ত আমল করার নির্দেশ আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে, তা আমরা করছি। কারণ, এ কাজগুলো আমাদের সামর্থ্যের বাইরে নয়। কিন্তু অন্তরে যেসব খেয়াল ও কুমন্ত্রণার সৃষ্টি হয় তার উপর তো আমাদের কোন এখতিয়ার নেই। সেগুলো তো মানুষের শক্তির বাইরের জিনিস। অথচ মহান আল্লাহ তারও হিসাব নেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। নবী করীম ﷺ বললেন, 'আপাতত তোমরা বল, আমরা শুনলাম ও মান্য করলাম।' এরপর সাহাবাদের শোনার ও মানার উদ্দীপনা দেখে মহান আল্লাহ উক্ত আয়াতকে [لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا] আয়াত দ্বারা মানসুখ (রহিত) করে দিলেন। *(ইবনে কাসীর ও ফাতহুল ক্বাদীর)* বুখারী-মুসলিম এবং অন্যান্য সুনান গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসটিও এর সমর্থন করে, "অবশ্যই আল্লাহ আমার উম্মতের অন্তরে উদীয়মান খেয়ালের কোন বিচার করবেন না, যে পর্যন্ত না তা কাজে পরিণত করবে অথবা মুখে উচ্চারণ করবে।" *(বুখারী ২৫২৮-মুসলিম ১২৭নং)* এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, অন্তরে উদিত খেয়ালের কোন হিসাব হবে না। কেবল সেই খেয়ালের হিসাব হবে, যা কাজে পরিণত করা হবে। (উক্ত) আয়াতের ব্যাপারে ইমাম ইবনে জারীরের বিপরীত মন্তব্য রয়েছে। তাঁর খেয়াল হল, আয়াতকে রহিত করা হয়নি। কেননা, হিসাব হলেই যে শাস্তি হবে তা জরুরী নয়। অর্থাৎ, এটা জরুরী নয় যে, মহান আল্লাহ যারই হিসাব নিবেন, তাকেই শাস্তি দিবেন। বরং তিনি হিসাব তো প্রত্যেকেরই নিবেন, কিন্তু অনেক মানুষ এমনও থাকবে যাদের হিসাব নেওয়ার পর আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা ক'রে দিবেন। কিছু লোকের সাথে তো এমনও ব্যবহার করা হবে যে, তাদের একটি একটি পাপকে স্মরণ করিয়ে স্বীকারোক্তি নিয়ে বলবেন, দুনিয়ায় এই পাপগুলোকে আমি গোপন করে রেখেছিলাম। যাও, আজ এগুলোকে আমি মাফ করে দিলাম। *(এই হাদীস সহীহ বুখারী ও মুসলিম ইত্যাদিতে বর্ণিত হয়েছে। ইবনে কাসীর)* কোন কোন উলামা বলেছেন, এখানে 'নাস্খ' (রহিত করণ) পারিভাষিক অর্থে বলা হয়নি, বরং কখনো কখনো 'নাস্খ' ব্যবহার করা হয় কোন জিনিসকে আরো পরিষ্কারভাবে বিশ্লেষণ ক'রে দেওয়ার অর্থে। তাই সাহাবাদের অন্তরে এই আয়াত থেকে যে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছিল সেটাকে দূর ক'রে দেওয়া হল [لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا] এই আয়াত এবং "অবশ্যই আল্লাহ আমার উম্মতের অন্তরের খেয়ালের বিচার করবেন না---।" এই হাদীস দ্বারা। এভাবে উভয় আয়াতের একটিকে 'নাসিখ' এবং অপরটি 'মানসূখ' ভাবার কোন প্রয়োজন হবে না।

([৪৯]) এই আয়াতে এমন কিছু বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে, যার উপর ঈমানদারদেরকে ঈমান আনতে বলা হয়েছে। এর পরের [لا يُكَلِّفُ اللهُ] আয়াতে আল্লাহর রহমত, তাঁর দয়া এবং তাঁর অনুগ্রহের কথা উল্লেখ ক'রে বলা হয়েছে যে, তিনি মানুষকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না। হাদীসে এই শেষ দুটি আয়াতের অনেক ফযীলতের কথা এসেছে। নবী করীম ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি সূরা বাক্বারার শেষের দু'টি আয়াত রাতে পড়ে নেয়, তার জন্য এই আয়াত দু'টিই যথেষ্ট হয়ে যায়।" *(বুখারী, ইবনে কাসীর)* অর্থাৎ, এই আমলের কারণে মহান আল্লাহ তার হেফাযত করবেন। অপর একটি হাদীসে এসেছে, নবী করীম ﷺ মিরাজের রাতে যে তিনটি জিনিস পেয়েছিলেন তার মধ্যে একটি ছিল, সূরা বাক্বারার শেষের এই দু'টি আয়াত। *(সহীহ মুসলিম)* অনেক বর্ণনায় এ কথাও এসেছে যে, এই সূরার শেষের আয়াত দু'টি রসূল ﷺ-কে আরশের নীচের একটি ভান্ডার থেকে দেওয়া হয় এবং এই আয়াত কেবল তাঁকেই দেওয়া হয়, অন্য কোন নবীকে দেওয়া হয়নি। *(আহমদ, নাসায়ী, ত্বাবারানী, বায়হাক্বী, হাকেম এবং দারেমী ইত্যাদি।)* মুআয ﷺ এই সূরা শেষ করে 'আমীন' বলতেন।" *(ইবনে কাসীর)*

বিরুদ্ধে আমাদেরকে (সাহায্য ও) জয়যুক্ত কর।

সূরা আলে ইমরান
(মদীনায় অবতীর্ণ)[৫০]
সূরা নং ঃ ৩, আয়াত সংখ্যা ঃ ২০০

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(১) আলিফ লা-ম মী-ম।

الم (١)

(২) আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন (সত্য) উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব ও সব কিছুর ধারক।[৫১]

اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ (٢)

(৩) তিনি সত্যসহ তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন,[৫২] যা ওর পূর্বের কিতাবের সমর্থক।

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ (٣)

(৪) পূর্বে তিনি মানবজাতিকে সৎপথ প্রদর্শনের জন্য[৫৩] তাওরাত ও ইঞ্জীল অবতীর্ণ করেছেন এবং তিনি ফুরক্বান (ন্যায়-অন্যায়ের মীমাংসাকারী; কুরআন) অবতীর্ণ করেছেন।[৫৪] নিশ্চয় যারা আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে অমান্য করে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। বস্তুতঃ আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ (٤)

(৫) নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে দ্যুলোক-ভূলোকের কোন কিছুই গোপন নেই।

إِنَّ اللهَ لا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ(٥)

([৫০]) এটি মাদানী সূরা। এই সূরার সমস্ত আয়াত হিজরতের পর বিভিন্ন সময়ে অবতীর্ণ হয়। সূরার প্রথম অংশগুলো অর্থাৎ, ৮৩ নং আয়াত পর্যন্ত নাজরানের খ্রিষ্টানদের প্রতিনিধি দলের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। এই দল ৯ম হিজরীতে নবী কারীম ﷺ-এর নিকট এসেছিল। তারা তাঁর সাথে তাদের খ্রিষ্টীয় আক্বীদা-বিশ্বাস এবং ইসলাম সম্পর্কে আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক করেছিল। তাদের প্রতিবাদ করা হয়েছিল এবং তাদেরকে 'মুবাহালা' করার প্রতি আহবানও জানানো হয়েছিল। এর বিস্তারিত আলোচনা পরে আসবে। এই ঘটনাকে সামনে রেখে কুরআনের এই আয়াতগুলো পাঠ করা হোক। (উল্লেখ্য যে, কেবল এই সূরাতেই 'আ-লু ইমরান'-এর উল্লেখ হয়েছে বলে এই সূরার নামকরণ হয় 'সূরাতু আলে ইমরান'।)

([৫১]) حَيٌّ এবং قَيُّــومٌ মহান আল্লাহর বিশেষ গুণ। 'হায়্যুন'এর অর্থ তিনি চিরঞ্জীব, তাঁর মৃত্যু ও ধ্বংস নেই। 'ক্বায়্যুম'এর অর্থ, তিনি নিখিল বিশ্বের ধারক, সংরক্ষণকারী এবং পর্যবেক্ষক। বিশ্বের সব কিছুই তাঁর মুখাপেক্ষী, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। খ্রিষ্টানরা ঈসা ﷺ-কে আল্লাহ অথবা তাঁর পুত্র কিংবা তিনের এক মনে করত। সুতরাং তাদেরকে বলা হচ্ছে যে, ঈসা ﷺও যখন আল্লাহর সৃষ্টি, তিনি মায়ের পেট থেকে জন্ম নিয়েছেন এবং তাঁর জন্মকালও পৃথিবী সৃষ্টির বহুকাল পর। তাহলে তিনি আল্লাহ অথবা তাঁর পুত্র কিভাবে হতে পারেন? যদি তোমাদের বিশ্বাস সঠিক হত, তাহলে সে সৃষ্টি হয়ে তাকে ইলাহী গুণের অধিকারী এবং অনাদি হওয়া উচিত ছিল। অনুরূপ তাঁর উপর মৃত্যু আসাও উচিত নয়, কিন্তু এমন এক সময় আসবে যখন মৃত্যু তাঁকে গ্রাস করবে। আর খ্রিষ্টানদের ধারণা অনুযায়ী তিনি তো মারাই গেছেন। বহু হাদীসে এসেছে যে, আল্লাহর ইসমে আ'যম (মহান নাম) তিনটি আয়াতে এসেছে। কেউ যদি এই নামের অসীলায় দুআ করে, তাহলে তা প্রত্যাখ্যাত হয় না। এক তো এই সূরা আলে-ইমরানে। দ্বিতীয় আয়াতুল কুরসীতে [اللهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ] এবং তৃতীয় সূরা ত্বাহাতে [وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ] *(ইবনে কাসীর-তাফসীর আয়াতুল কুরসী)*

([৫২]) অর্থাৎ, এটা যে আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ তাতে কোন সন্দেহ নেই। আর কিতাব বলতে কুরআন মাজীদ।

([৫৩]) ইতিপূর্বে নবীদের উপর যে কিতাবসমূহ নাযিল হয়েছে, এই কিতাব সেগুলোর সত্যায়ন করে। অর্থাৎ, সে কিতাবগুলোতে যে কথাগুলো লিপিবদ্ধ ছিল, তার সত্যায়ন করে এবং তাতে যে সব ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণিত হয়েছে, তা সত্য বলে স্বীকার করে। আর এর পরিষ্কার অর্থ হল, কুরআন কারীমও সেই সত্তার পক্ষ হতে অবতীর্ণ, যে সত্তা পূর্বেও বহু কিতাব নাযিল করেছেন। এটা যদি কোন অন্য পক্ষ হতে আসত অথবা মানুষের চেষ্টার ফল হত, তাহলে এর এবং উক্ত কিতাবগুলোর মধ্যে পারস্পরিক মিল থাকার পরিবর্তে অমিলই থাকত।

([৫৪]) অর্থাৎ, অবশ্যই তাওরাত এবং ইঞ্জীল স্ব স্ব সময়ে মানুষের হিদায়াতের উৎস ছিল। কারণ এগুলোর অবতীর্ণ হওয়ার উদ্দেশ্যই ছিল এটাই। এরপর 'তিনি ফুরক্বান অবতীর্ণ করেছেন' বলে এ কথা পরিষ্কার ক'রে দিলেন যে, তাওরাত ও ইঞ্জীলের যামানা শেষ হয়ে গেছে। এখন তো কুরআন অবতীর্ণ হয়ে গেছে। আর কুরআনই হল ফুরক্বান এবং সত্য ও মিথ্যা জানার এটাই হল কষ্টিপাথর। এটাকে সত্য বলে বিশ্বাস না করলে আল্লাহর নিকট কেউ মুসলিম ও মু'মিন হতে পারবে না।

هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٦)

(৬) তিনিই মাতৃগর্ভে যেভাবে ইচ্ছা তোমাদের আকৃতি গঠন করেন। তিনি ব্যতীত অন্য কোন (সত্যিকার) উপাস্য নেই।[৫৫] তিনি প্রবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُوا الأَلْبَابِ (٧)

(৭) তিনিই তোমার প্রতি এই কিতাব (কুরআন) অবতীর্ণ করেছেন; যার কিছু আয়াত সুস্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন, এগুলি কিতাবের মূল অংশ; যার অন্যগুলি রূপক;[৫৬] যাদের মনে বক্রতা আছে, তারা ফিতনা (বিশৃংখলা) সৃষ্টি ও ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে যা রূপক তার অনুসরণ করে। বস্তুতঃ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না।[৫৭] আর যারা সুবিজ্ঞ তারা বলে, আমরা এ বিশ্বাস করি। সমস্তই আমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে আগত। বস্তুতঃ বুদ্ধিমান লোকেরাই উপদেশ গ্রহণ করে।

رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (٨)

(৮) হে আমাদের প্রতিপালক! সরল পথ প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে বক্র ক'রে দিও না এবং তোমার নিকট থেকে আমাদেরকে করুণা দান কর। নিশ্চয় তুমি মহাদাতা।

رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللهَ لا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ (٩)

(৯) হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি মানবজাতিকে একদিন একত্রে সমাবেশ করবে -- এতে কোন সন্দেহ নেই; নিশ্চয়ই আল্লাহ নির্ধারিত সময়ের ব্যতিক্রম (প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ) করেন না।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ مِنَ اللهِ شَيْئاً وَأُوْلَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ (١٠)

(১০) যারা অবিশ্বাস করে তাদের ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহর নিকট কোন কাজে লাগবে না। এবং এ সকল লোকই দোযখের ইন্ধন হবে।

كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ (١١)

(১১) ফিরআউনের বংশধরগণও তাদের পূর্ববর্তীগণের মত তারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা মনে করেছিল, ফলে আল্লাহ তাদের পাপের জন্য তাদেরকে শাস্তিদান করেছিলেন। বস্তুতঃ আল্লাহ

([৫৫]) সুশ্রী অথবা কুশ্রী, ছেলে অথবা মেয়ে, সৌভাগ্যবান অথবা দুর্ভাগ্যবান এবং পূর্ণাঙ্গ অথবা বিকলাঙ্গ ইত্যাদি বিচিত্রময়তা মায়ের গর্ভে যখন এককভাবে আল্লাহই সৃষ্টি করেন, তখন ঈসা ﷺ ইলাহ কিভাবে হতে পারেন? তিনি নিজেও তো সৃষ্টির নানা পর্যায় অতিক্রম ক'রে দুনিয়াতে এসেছেন। মহান আল্লাহ তাঁরও সৃষ্টি সম্পাদন করেছেন তাঁর মায়ের গর্ভে।

([৫৬]) مُحكَمَات (সুস্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন) সেই আয়াতসমূহকে বলা হয় যাতে যাবতীয় আদেশ-নিষেধ, বিধি-বিধান, মাসলা-মাসায়েল এবং ইতিহাস ও কাহিনী আলোচিত হয়েছে; যার অর্থ স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন এবং যেগুলো বুঝতে কোন প্রকার অসুবিধা হয় না। আর مُتَشَابِهَات (রূপক) আয়াতগুলো এর বিপরীত। যেমন, আল্লাহর সত্তা, ভাগ্য সম্পর্কীয় বিষয়াদি, জান্নাত ও জাহান্নাম এবং ফিরিশ্তা ইত্যাদির ব্যাপার। অর্থাৎ, এমন বাস্তব জিনিস যার বাস্তবতা উপলব্ধি করতে মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি অপারগ অথবা যে ব্যাপারে এমন ব্যাখ্যা করার অবকাশ বা তাতে এমন অস্পষ্টতা ও দ্ব্যর্থতা থাকে যে, তার দ্বারা সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতায় ফেলা সম্ভব হয়। এই কারণেই বলা হচ্ছে যে, যাদের অন্তরে বক্রতা থাকে, তারাই অস্পষ্ট আয়াতগুলোর পিছনে পড়ে থাকে এবং সেগুলোর মাধ্যমে ফিৎনা সৃষ্টি করে। যেমন খ্রিষ্টানদের অবস্থা; কুরআন ঈসা ﷺ-কে আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রসূল বলেছে। এটা একটি পরিষ্কার ও দ্ব্যর্থহীন কথা। কিন্তু খ্রিষ্টানরা এটাকে বাদ দিয়ে কুরআনে যে ঈসা ﷺ-কে 'রুহুল্লাহ' এবং 'কালিমাতুল্লাহ' বলা হয়েছে, সেটাকেই নিজেদের ভ্রষ্ট আক্বীদার দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছে। অথচ তা ভুল। অনুরূপ অবস্থা বিদআতীদেরও; কুরআনের সুস্পষ্ট আক্বীদার বিপরীত বিদআতীরা যে ভ্রান্ত আক্বীদা গড়ে রেখেছে, তাও এই 'মুতাশাবিহাত' (অস্পষ্ট) আয়াতগুলোর ভিত্তিতেই। আবার কখনো নিজেদের দার্শনিক চিন্তাধারার কঠিন পেঁচ দ্বারা 'সুস্পষ্ট' আয়াতগুলোকে 'অস্পষ্ট' বানিয়ে ফেলে। (আল্লাহ আমাদেরকে এ কাজ হতে পানাহ দিন।) পক্ষান্তরে সঠিক আক্বীদা অবলম্বী মুসলিম 'সুস্পষ্ট' আয়াতগুলোর উপর আমল করে এবং 'অস্পষ্ট' আয়াতগুলোর ব্যাপারে সন্দেহ হলে, সেগুলোকে 'সুস্পষ্ট' আয়াতগুলোর আলোকে বুঝতে চেষ্টা করে। কেননা, কুরআন 'সুস্পষ্ট' আয়াতগুলোকেই কিতাবের 'মূল অংশ' বলে আখ্যায়িত করেছে। এর ফলে তারা ফিৎনা থেকে বেঁচে যায় এবং আক্বীদার বিভ্রান্তি থেকেও রেহাই পায়। আল্লাহ আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আমীন।

([৫৭]) 'তা'বীল'-এর এক অর্থ হল, কোন জিনিসের আসল প্রকৃতত্ব, তত্ত্ব ও তাৎপর্য। এই অর্থের দিকে খেয়াল ক'রে 'ইল্লাল্লা-হ' পড়ে থামা জরুরী। কারণ, প্রত্যেক জিনিসের আসল প্রকৃতত্ব স্পষ্টভাবে কেবল মহান আল্লাহই জানেন। 'তা'বীল'এর দ্বিতীয় অর্থ হল, কোন জিনিসের ব্যাখ্যা, অর্থপ্রকাশ এবং পরিষ্কারভাবে তা বর্ণনা করা। এই অর্থের দিক দিয়ে 'ইল্লাল্লা-হ' পড়ে না থেমে [وَالرَّاسِخُوْنَ فِي الْعِلْـمِ] পড়ে থামা যায়। কারণ, গভীর জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিরাও সঠিক ব্যাখ্যা এবং সুস্পষ্ট বর্ণনা দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন। 'তা'বীল'এর এই উভয় অর্থ কুরআনে কারীমে ব্যবহৃত হয়েছে। *(ইবনে কাসীর থেকে সারাংশ)*

দন্ডদানে অত্যন্ত কঠোর।

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ (١٢)

(১২) যারা অবিশ্বাস করে তাদেরকে বল, তোমরা শীঘ্রই পরাজিত হবে[৫৮] এবং তোমাদেরকে দোযখে একত্রিত করা হবে। আর তা অতি মন্দ শয়নাগার।

قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لأُوْلِي الأَبْصَارِ (١٣)

(১৩) (বদর যুদ্ধে) দুইটি দলের পরস্পর সম্মুখীন হওয়ার মধ্যে তোমাদের জন্য নিদর্শন ছিল। একদল আল্লাহর পথে সংগ্রাম করছিল এবং অন্যদল অবিশ্বাসী ছিল। তারা বাহ্যদৃষ্টিতে ওদেরকে নিজেদের দ্বিগুণ দেখছিল।[৫৯] আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা নিজ সাহায্য দ্বারা শক্তিশালী করেন। নিশ্চয় এতে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকেদের জন্য উপদেশ রয়েছে।

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنْ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ

(১৪) নারী, সন্তান-সন্ততি, জমাকৃত সোনা-রূপার ভান্ডার, পছন্দসই (চিহ্নিত) ঘোড়া, চতুষ্পদ জন্তু ও ক্ষেত-খামার প্রভৃতি কমনীয় জিনিসকে মানুষের নিকট শোভনীয় করা হয়েছে।[৬০] এ সব

([৫৮]) এখানে কাফের বা অবিশ্বাসী বলতে ইয়াহুদীদেরকে বুঝানো হয়েছে। আর এই ভবিষ্যদ্বাণী খুব শীঘ্রই বাস্তবায়িত হয়েছিল। যেমন, বানু ক্বাইনুক্বা' ও বানু নাযীরকে দেশ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল এবং বানু ক্বুরায়যাকে হত্যা করা হয়েছিল। অতঃপর খায়বার বিজয়ের পর সমস্ত ইয়াহুদীদের উপর জিযিয়া-কর আরোপ করা হয়েছিল। *(ফাতহুল ক্বাদীর)*

([৫৯]) অর্থাৎ, প্রত্যেক দল অপর দলকে নিজেদের থেকে দ্বিগুণ দেখছিল। কাফেরদের সংখ্যা এক হাজারের কাছাকাছি ছিল। তাদের নজরে মুসলিমদের সংখ্যা প্রায় দু' হাজার দেখাচ্ছিল। এরূপ প্রদর্শনে উদ্দেশ্য ছিল, তাদের অন্তরে মুসলিমদের ভয় প্রবেশ করানো। এ দিকে মুসলিমদের সংখ্যা ছিল তিনশ'র কিছু বেশী (৩১৩ জন)। তাদের নজরে কাফেরদের সংখ্যা দেখাচ্ছিল (নিজেদের দ্বিগুণ) ছয়শ' ও সাতশ'র মাঝামাঝি। অথচ তাদের প্রকৃত সংখ্যা ছিল প্রায় এক হাজার। এ থেকে লক্ষ্য ছিল, মুসলিমদের উৎসাহ ও উদ্দীপনাকে আরো বৃদ্ধি করা। নিজেদের সংখ্যা থেকে কাফেরদের সংখ্যা তিনগুণ দেখে মুসলিমদের ভয় পেয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। যখন তারা দেখলো কাফেররা তাদের থেকে সংখ্যায় তিনগুণ নয়; বরং দ্বিগুণ, তখন তাদের উৎসাহ ও মনোবল দমলো না। তবে দ্বিগুণ দেখার এই ব্যাপারটা ছিল প্রাথমিক পর্যায়ে, পরে যখন উভয় দল মুখোমুখি সারিবদ্ধ হল, তখন মহান আল্লাহ উভয় দলকে একে অপরের দৃষ্টিতে কম দেখালেন। যাতে কোন দলই যেন যুদ্ধের ময়দান থেকে পশ্চাৎপদ না হয়ে প্রত্যেকেই (আক্রমণের জন্য) সামনে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে। *(ইবনে কাসীর)* সূরা আনফালের ৪৪নং আয়াতে এর বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। এটা বদর যুদ্ধের ঘটনা। এ যুদ্ধ হিজরতের দ্বিতীয় বছরে মুসলিম ও কাফেরদের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল। কয়েক দিক দিয়ে এটি ছিল বড়ই গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ। প্রথমতঃ এটি ছিল প্রথম যুদ্ধ। দ্বিতীয়তঃ পূর্বে কোন প্ল্যান-পরিকল্পনা ছাড়াই ছিল এই যুদ্ধ। সিরিয়া থেকে বাণিজ্য-সামগ্রী নিয়ে মক্কাগামী আবূ সুফিয়ানের কাফেলার পথ অবরোধ করার জন্য মুসলিমরা বের হয়েছিলেন। কিন্তু আবূ সুফিয়ান টের পেয়ে যায় এবং সে তার কাফেলা নিয়ে অন্য পথ ধরে চলে যায়। এদিকে মক্কার কাফেররা নিজেদের শক্তি ও সংখ্যার আধিক্যের দাম্ভিকতায় মুসলিমদের উপর আক্রমণ করার জন্য বদরের ময়দান পর্যন্ত যাত্রা করে এবং সেখানে সর্বপ্রথম এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তৃতীয়তঃ এই যুদ্ধে মুসলিমরা আল্লাহর বিশেষ সাহায্য লাভে ধন্য হন। চতুর্থতঃ এতে কাফেররা এমন শিক্ষামূলক পরাজয় বরণ করে যে, আগামীর জন্য তাদের মনোবল ভেঙ্গে যায়।

([৬০]) 'কমনীয় জিনিস' বলতে এখানে এমন সব জিনিসকে বুঝানো হয়েছে, প্রাকৃতিকভাবে মানুষ যার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং যা পছন্দ করে। এই জন্যই তার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া এবং তা ভালবাসা অপছন্দনীয় নয়। তবে শর্ত হল তা মধ্যম পন্থায় এবং শরীয়তের গন্ডির ভিতর হতে হবে। আকর্ষণীয় এই সুশোভন আল্লাহর পক্ষ হতে মানুষের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ। তিনি বলেন, "আমি পৃথিবীস্থ সব কিছুকে পৃথিবীর জন্য শোভা করেছি মানুষকে পরীক্ষার জন্য---।" *(সূরা কাহফ ৭ আয়াত)* আলোচ্য আয়াতে কমনীয় জিনিসের মধ্যে সর্বপ্রথম মহিলার কথা উল্লেখ হয়েছে। কারণ, সাবালক হওয়ার পর প্রত্যেক মানুষের সব থেকে বেশী প্রয়োজন বোধ হয় একজন সঙ্গিনীর। তাছাড়া রমণী পুরুষের কাছে সর্বাধিক বেশী রমণীয় ও কমনীয়। স্বয়ং নবী করীম ﷺ বলেছেন, "মহিলা এবং সুগন্ধি আমার নিকট অতি প্রিয় জিনিস।" *(মুসনাদে আহমাদ)* অনুরূপ তিনি বলেছেন, "নারী হল দুনিয়ার সব চেয়ে উৎকৃষ্টমানের সামগ্রী।" সুতরাং যদি নারীর প্রতি ভালবাসা শরীয়তের সীমা অতিক্রম না করে, তাহলে তা হল উত্তম জীবন সঙ্গিনী এবং আখেরাতের সম্বলও। পক্ষান্তরে (এত প্রয়োজনীয় বলেই) এই নারীই হল দুনিয়ার সর্বাপেক্ষা বড় ফিৎনা। রসূল ﷺ বলেন, "আমার পর যেসব ফিৎনা সংঘটিত হবে তার মধ্যে পুরুষদের জন্য সব থেকে বড় ক্ষতিকর ফিৎনা হবে নারী।" *(বুখারী ৫০৯৬নং)* পুত্র-সন্তানদের ব্যাপারটাও অনুরূপ। এ থেকে যদি উদ্দেশ্য মুসলিমদের শক্তি বৃদ্ধি এবং বংশ বহাল ও বৃদ্ধি করা হয়, তবে তা প্রশংসনীয়; অন্যথা তা হবে নিন্দনীয়। রসূল ﷺ বলেন, "এমন নারীকে বিবাহ কর যে বেশী স্বামী-ভক্তা হবে এবং বেশী বেশী সন্তান প্রসব করবে। কারণ কিয়ামতের দিন আমার উম্মত বেশী হওয়ার জন্য আমি গর্ববোধ করব।" এই আয়াতে বৈরাগ্যবাদ এবং জন্মনিয়ন্ত্রণ বা পরিবার-পরিকল্পনার আন্দোলন খন্ডন করা হয়েছে। কেননা, আয়াতে 'বানীন' শব্দ বহুবচন। ধন-সম্পদ থেকেও উদ্দেশ্য যদি জীবন ধারণ করা, আত্মীয়দের সাহায্য করা, সাদক্বা-খয়রাত করা এবং তা কল্যাণকর পথে ব্যয় করা ও পরের কাছে চাওয়া থেকে বাঁচা হয়, তাহলে তাতে আল্লাহ সন্তুষ্ট হবেন এবং এই লক্ষ্যে তার

ইহজীবনের ভোগ্য বস্তু। আর আল্লাহর নিকটেই উত্তম আশ্রয়স্থল রয়েছে।

وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ (١٤)

(১৫) বল, আমি কি তোমাদেরকে এ সব বস্তু হতে উৎকৃষ্ট কোন কিছুর সংবাদ দেব? যারা সাবধান (পরহেযগার) হয়ে চলে তাদের জন্য রয়েছে উদ্যানসমূহ যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে,[৬১] তাদের জন্য পবিত্রা সঙ্গিনীগণ[৬২] এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি রয়েছে। বস্তুতঃ আল্লাহ তার দাসদের সম্বন্ধে সম্যক অবহিত।

قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللهِ وَاللهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (١٥)

(১৬) যারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয় আমরা বিশ্বাস করেছি; অতএব আমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা কর এবং দোযখের শাস্তি থেকে আমাদেরকে রক্ষা কর।'

الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (١٦)

(১৭) যারা ধৈর্যশীল, সত্যবাদী, অনুগত, দানশীল এবং রাত্রির শেষাংশে ক্ষমাপ্রার্থী।

الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالأَسْحَارِ (١٧)

(১৮) আল্লাহ সাক্ষ্য দেন এবং ফিরিশ্তাগণ ও জ্ঞানী ব্যক্তিগণও সাক্ষ্য দেয় যে, তিনি ব্যতীত অন্য কোন (সত্য) উপাস্য নেই।[৬৩] তিনি ন্যায় প্রতিষ্ঠাকারী। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন (সত্য) উপাস্য নেই; তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।

شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُوْلُوا الْعِلْمِ قَائِماً بِالْقِسْطِ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (١٨)

(মালের) প্রতি ভালবাসাও হবে প্রশংসনীয়, অন্যথা তা হবে নিন্দনীয়। ঘোড়া থেকে উদ্দেশ্য হবে জিহাদের প্রস্তুতি। অন্যান্য পশু দ্বারা যদি লক্ষ্য হয় চাষাবাদ করা, বোঝা বহনের কাজ নেওয়া এবং জমি থেকে ফসলাদি উৎপন্ন করা, তাহলে তা অবশ্যই প্রশংসনীয়। কিন্তু যদি লক্ষ্য হয় কেবল দুনিয়া অর্জন এবং তা নিয়ে যদি গর্ব ও অহঙ্কার ক'রে আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন হয়ে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন নিয়েই মেতে থাকা হয়, তাহলে লাভদায়ক এই জিনিসগুলোই সর্বনাশের হেতু হবে। قَنَاطِيْرُ হল قِنْطَارٌ এর বহুবচন। অর্থ হল, ধন-ভান্ডার। অর্থাৎ, সোনা-রূপা এবং মাল-ধনের আধিক্য। الْمُسَوَّمَةِ এমন ঘোড়া যাকে চারণভূমিতে চরে খাওয়ার জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছে অথবা এমন ঘোড়া যাকে জেহাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে কিংবা এমন ঘোড়া যাকে অন্য থেকে পার্থক্য করার জন্য কোন কিছু দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে। *(ফাতহুল ক্বাদীর-ইবনে কাসীর)*

(৬১) এই আয়াতে ঈমানদারদেরকে হুঁশিয়ার করা হচ্ছে যে, উল্লিখিত পার্থিব জিনিসেই তোমরা নিজেদেরকে হারিয়ে ফেলো না, বরং এর চেয়ে উত্তম হল সেই জীবন ও সেই নিয়ামত, যা রয়েছে প্রতিপালকের কাছে এবং যার অধিকারী হবে কেবল আল্লাহভীরু লোকেরা। অতএব তোমরা আল্লাহভীরুতা অবলম্বন করো। এই আল্লাহভীরুতার গুণ তোমাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়ে গেলে, নিশ্চিতভাবে তোমরা দ্বীন ও দুনিয়ার সমূহ কল্যাণ দ্বারা নিজেদের ঝুলি ভরে নিবে।

(৬২) পবিত্রা সঙ্গিনীগণ ঃ অর্থাৎ, তারা পার্থিব নোংরামী, হায়েয-নিফাস এবং অন্যান্য অপবিত্রতা থেকে পবিত্রা এবং নির্মলচরিত্রা হবে। এর পরের দু'টি আয়াতে আল্লাহভীরু লোকদের গুণাবলীর কথা উল্লেখ হয়েছে।

(৬৩) 'শাহাদাত' (সাক্ষ্য)এর অর্থ বর্ণনা ও অবহিত করা। অর্থাৎ, মহান আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং বর্ণনা করেছেন, তার দ্বারা তিনি আমাদেরকে স্বীয় একত্ববাদের প্রতি পথপ্রদর্শন করেছেন। *(ফাতহুল ক্বাদীর)* ফিরিশ্তাগণ এবং জ্ঞানিগণও তাঁর একত্ববাদের সাক্ষ্য দেন। এতে জ্ঞানী ব্যক্তিদের বড়ই ফযীলত ও মাহাত্ম্য প্রকাশ পায়। কেননা মহান আল্লাহ স্বীয় ফিরিশ্তাদের পাশাপাশি তাঁদেরকে উল্লেখ করেছেন। তবে জ্ঞানী বলতে তাঁরা, যাঁরা কিতাব ও সুন্নাহর জ্ঞানার্জন ক'রে ধন্য হয়েছেন। *(ফাতহুল ক্বাদীর)*

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللهِ الإِسْلامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللهِ فَإِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (١٩)

(১৯) নিশ্চয় ইসলাম আল্লাহর নিকট (একমাত্র মনোনীত) ধর্ম।[৬৪] যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তারা পরস্পর বিদ্বেষবশতঃ তাদের নিকট জ্ঞান আসার পরও তাদের মধ্যে মতানৈক্য ঘটিয়েছিল![৬৫] আর যে আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে[৬৬] অস্বীকার করে (সে জেনে রাখুক যে), নিশ্চয় আল্লাহ সত্বর হিসাব গ্রহণকারী।

فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ للهِ وَمَنْ اتَّبَعَنِي وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَاللهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (٢٠)

(২০) অতঃপর যদি তারা তোমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়, তাহলে তুমি বল, 'আমি ও আমার অনুসারিগণ আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করেছি।' আর যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে, তাদেরকে ও নিরক্ষরদেরকে[৬৭] বল, 'তোমরা কি আত্মসমর্পণ করেছ?' সুতরাং যদি তারা আত্মসমর্পণ করে, তাহলে নিশ্চয় তারা সুপথ পাবে। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে তোমার কর্তব্য কেবল প্রচার করা। বস্তুতঃ আল্লাহ তার দাসদের সম্বন্ধে সম্যক অবহিত।

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ

(২১) যারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে অবিশ্বাস করে, নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে এবং যে সকল লোক ন্যায়পরায়ণতার নির্দেশ দেয় তাদেরকেও হত্যা করে,[৬৮] তুমি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক

---

(৬৪) ইসলাম সেই মনোনীত দ্বীন, যার প্রতি সকল নবীগণ স্ব স্ব যুগে আহবান করেছেন এবং যার শিক্ষা দিয়েছেন। আর এখন এই ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপ হল সেটাই, যা শেষ নবী মুহাম্মাদ ﷺ বিশ্ববাসীর সামনে পেশ করেছেন। যাতে আছে যে, তাওহীদ, রিসালাত এবং আখেরাতের উপর ঐভাবেই ঈমান আনতে হবে ও বিশ্বাস করতে হবে, যেভাবে নবী করীম ﷺ নির্দেশ দিয়েছেন। এখন কেবল আল্লাহকে এক মনে ক'রে নিলেই অথবা কিছু সৎকর্ম করে নিলেই যে ইসলাম প্রতিষ্ঠা হবে এবং আখেরাতে মুক্তি পাওয়া যাবে তা নয়; বরং ঈমান, ইসলামের দাবী হল, আল্লাহকে এক মনে ক'রে কেবল তাঁরই ইবাদত করা। মুহাম্মাদ ﷺ সহ সকল নবীদের উপর ঈমান আনা। নবী করীম ﷺ-এর পর আর কোন নবী আসবেন না, এ কথাও স্বীকার ক'রে নেওয়া। আর এই ঈমানের সাথে সাথে সেই আক্বীদা ও আমলগুলো পালন করতে হবে, যেগুলো কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এখন আল্লাহর নিকট দ্বীনে-ইসলাম ব্যতীত আর কোন দ্বীন গৃহীত হবে না। মহান আল্লাহ বলেন, "যে কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম অন্বেষণ করবে, তার পক্ষ হতে তা কখনও গ্রহণ করা হবে না। আর সে হবে পরলোকে ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত।" *(সূরা আলে ইমরান ৮৫ আয়াত)* নবী করীম ﷺ-এর নবুঅত ও রিসালাত সমগ্র মানবতার জন্য। [قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً] "বলে দাও, হে মানবমন্ডলী! তোমাদের সবার প্রতি আমি আল্লাহর প্রেরিত রসূল।" *(সূরা আ'রাফ ১৫৮ আয়াত)* [تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً] "পরম বরকতময় তিনি, যিনি তাঁর বান্দার প্রতি ফুরক্বান অবতীর্ণ করেছেন, যাতে সে সমগ্র বিশ্বের জন্য সতর্ককারী হয়।" *(সূরা ফুরক্বান ১ আয়াত)* হাদীসে রসূল ﷺ বলেছেন, "সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ আছে! ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদের যে কেউ আমার উপর ঈমান না এনেই মারা যাবে, সে জাহান্নামী হবে।" *(সহীহ মুসলিম)* তিনি আরো বলেন, "আমি সাদা-কালো সকলের প্রতি প্রেরিত হয়েছি।" (অর্থাৎ, সকল মানুষের জন্য নবী হয়ে প্রেরিত হয়েছি।) আর এই কারণেই তিনি সেই সময়ের সমস্ত বাদশাহদের প্রতি পত্র প্রেরণ ক'রে তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দেন। *(বুখারী, মুসলিম, ইবনে কাসীর)*

(৬৫) 'মতানৈক্য' বলতে তাদের পারস্পরিক এমন মতবিরোধ যা একই ধর্মের অনুসারীরা আপোসে বাধিয়ে রেখেছিল। যেমন, ইয়াহুদীদের পারস্পরিক মতবিরোধ এবং আপোসের বিচ্ছিন্নতা ও দলাদলি। অনুরূপ খ্রিষ্টানদের পারস্পরিক বিরোধিতা ও আপোসের বিচ্ছিন্নতা। তাছাড়া আহলে কিতাবদের পারস্পরিক মতবিরোধকেও বুঝানো হয়েছে। যে বিরোধ ও মতানৈক্যের কারণে ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানরা একে অপরকে বলত, "কোন কিছুর উপর তোমাদের ভিত্তি নেই।" মুহাম্মাদ ﷺ এবং ঈসা ﷺ-এর নবুঅতকে নিয়ে যে বিরোধ, তাও এর অন্তর্ভুক্ত। আর এই সকল মতবিরোধ কোন দলীলের ভিত্তিতে ছিল না। কেবল হিংসা-বিদ্বেষ এবং শত্রুতার কারণে ছিল। অর্থাৎ, তারা সত্যকে জেনে ও চিনেছিল; কিন্তু তা সত্ত্বেও কেবল দুনিয়ার খেয়ালী স্বার্থের পিছনে পড়ে ভ্রান্তমূলক কথার উপরে কায়েম থাকত এবং সেটাকেই দ্বীন বুঝানোর চেষ্টা করত। যাতে তাদের নাকও যেন উঁচু থাকে এবং জনগণের মাঝে তাদের বিশ্বস্ততাও যেন প্রতিষ্ঠিত থাকে। পরিতাপের বিষয় যে, ইদানীং মুসলিম উলামাদের এক বিরাট সংখ্যক দল ঠিক এই ধরনেরই জঘন্য উদ্দেশ্য সাধনের তাকীদে তাদের মতনই ভ্রান্ত পথ অবলম্বন ক'রে চলেছে। আল্লাহ তাদেরকে ও আমাদেরকে হিদায়াত করুন। আমীন।

(৬৬) এখানে 'নিদর্শন' বলতে সেই সব নিদর্শন, যা প্রমাণ করে যে, ইসলাম আল্লাহরই মনোনীত দ্বীন।

(৬৭) 'নিরক্ষর' বলতে আরবের মুশরিকদের বুঝানো হয়েছে। তারা আহলে কিতাবদের তুলনায় সাধারণভাবে নিরক্ষর ছিল।

(৬৮) তাদের অবাধ্যতা ও হঠকারিতা এত দূর পর্যন্ত পৌঁছে ছিল যে, কেবল তারা নবীদেরকেই অন্যায়ভাবে হত্যা করেনি, বরং এমন লোকদেরকেও তারা হত্যা করেছিল যারা ন্যায়সংগত ও সুবিচারপূর্ণ কথা বলত। অর্থাৎ, যাঁরা নিষ্ঠাবান মু'মিন, সত্যের প্রতি আহবানকারী এবং ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা দানকারী ছিলেন তাঁদেরকে নবীদের পাশাপাশি উল্লেখ ক'রে মহান আল্লাহ তাঁদের মাহাত্ম্য ও ফযীলতের কথাও পরিষ্কার ক'রে দিলেন।

حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٢١)

শাস্তির সুসংবাদ দাও।

أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (٢٢)

(২২) এই সব লোকের সকল আমল ইহকাল ও পরকালে নিষ্ফল হবে এবং তাদের কোন সাহায্যকারী নেই।

أَلَمْ تَرَى إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ (٢٣)

(২৩) তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যাদেরকে কিতাবের কিছু অংশ প্রদান করা হয়েছিল? তাদেরকে আল্লাহর কিতাবের দিকে আহবান করা হয়, যাতে তা তাদের মধ্যে মীমাংসা ক'রে দেয়; অতঃপর তাদের একদল পরাঙ্মুখ হয়ে ফিরে দাঁড়ায়।[৬৯]

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (٢٤)

(২৪) এ জন্য যে তারা বলে, 'নির্দিষ্ট কিছু দিন ব্যতীত দোযখের আগুন আমাদেরকে স্পর্শ করবে না।' আসলে তাদের নিজেদের ধর্ম সম্বন্ধে (উক্ত) মিথ্যা উদ্ভাবন তাদেরকে প্রবঞ্চিত করেছে।[৭০]

فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (٢٥)

(২৫) কিন্তু যেদিন আমি তাদেরকে একত্র করব, সেই (শেষ বিচারের) দিন তাদের কি দশা হবে, যেদিন সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই? (যেদিন) প্রত্যেককে তার কৃতকার্যের প্রতিদান পূর্ণভাবে দেওয়া হবে এবং তাদের প্রতি কোন অন্যায় করা হবে না।[৭১]

قُلِ اللهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٢٦)

(২৬) বল, 'হে রাজ্যাধিপতি আল্লাহ! তুমি যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান কর এবং যার নিকট থেকে ইচ্ছা রাজত্ব কেড়ে নাও, যাকে ইচ্ছা সম্মানিত কর এবং যাকে ইচ্ছা অপমানিত কর। তোমার হাতেই যাবতীয় কল্যাণ।[৭২] নিশ্চয় তুমি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ

(২৭) তুমি রাতকে দিনে এবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করাও,[৭৩] তুমিই মৃত হতে জীবন্তের আবির্ভাব ঘটাও, আবার জীবন্ত থেকে মৃতের আবির্ভাব ঘটাও।[৭৪] তুমি যাকে ইচ্ছা

(৬৯) এই আহলে কিতাব থেকে মদীনার ইয়াহুদীদেরকে বুঝানো হয়েছে। যাদের অধিকাংশই ইসলাম গ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ থেকে বঞ্চিত ছিল। তারা ইসলাম, মুসলিম ও নবী কারীম ﷺ-এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার কাজে লিপ্ত থাকত। ফলে তাদের দু'টি গোত্রকে দেশ থেকে বহিস্কার করা হয়েছিল এবং একটি গোত্রকে হত্যা করা হয়েছিল।

(৭০) অর্থাৎ, আল্লাহর কিতাবকে অমান্য করা এবং তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার কারণে তাদের মধ্যে এই ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে, তারা কখনোও জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। আর যদি জাহান্নামে প্রবেশ করেও তাহলে তা হবে কেবল কয়েক দিনের জন্য। আর এই মিথ্যা উদ্ভাবন ও অমূলক ধারণাই তাদেরকে প্রবঞ্চনা ও ধোঁকার মধ্যে ফেলে রেখেছে।

(৭১) কিয়ামতের দিন তাদের এই মৌখিক দাবী এবং ভ্রান্ত ধারণা কোন কাজে আসবে না। সেদিন মহান আল্লাহ তাঁর সূক্ষ্ম সুবিচারের মাধ্যমে প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের পরিপূর্ণ প্রতিদান দেবেন। কারো উপর কোন প্রকার যুলুম করা হবে না।

(৭২) এই আয়াতে রয়েছে মহান আল্লাহর সীমাহীন শক্তি ও তাঁর মহা কুদরতের প্রকাশ। তিনি বাদশাহকে ফকীর করেন এবং ফকীরকে বাদশাহ। তিনিই সমস্ত কর্তৃত্বের মালিক। الْخَيْرُ بِيَدِكَ (যাবতীয় কল্যাণ তোমার হাতে) না বলে, بِيَدِكَ الْخَيْرُ (তোমারই হাতে যাবতীয় কল্যাণ) বলা হয়েছে। অর্থাৎ, বিধেয় পদকে আগে আনা হয়েছে। উদ্দেশ্য নির্দিষ্টীকরণ। অর্থাৎ, সমস্ত কল্যাণ কেবল তোমার হাতেই। তুমি ছাড়া কল্যাণদাতা আর কেউ নেই। অকল্যাণের স্রষ্টা যদিও মহান আল্লাহই, তবুও এখানে কেবল কল্যাণের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে, অকল্যাণের নয়। কারণ, কল্যাণ আল্লাহর নিছক অনুগ্রহ। পক্ষান্তরে অকল্যাণ হল মানুষের কর্মের ফল যা তাদেরকে ভুগতে হয়। অথবা অকল্যাণও যেহেতু তাঁরই নির্ধারিত নিয়তির অংশ, সুতরাং তাতেও কোন না কোন প্রকার মঙ্গল আছে। এই দিক দিয়ে তাঁর সমস্ত কাজই কল্যাণময়। *(ফাতহুল ক্বাদীর)*

(৭৩) রাতকে দিনে এবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করানোর অর্থ হল ঋতুর পরিবর্তন। যখন রাত লম্বা হয়, তখন দিন ছোট হয়ে যায়। আবার অন্য ঋতুতে যখন দিন বড় হয়, তখন রাত ছোট হয়ে যায়। অর্থাৎ, কখনো রাতের অংশকে দিনের মধ্যে এবং দিনের অংশকে রাতের মধ্যে ঢুকিয়ে দেন। যার কারণে রাত ও দিন ছোট-বড় হয়ে যায়।

(৭৪) যেমন (মৃত) বীর্য যা জীবন্ত মানুষ থেকে বের হয়। অতঃপর সেই মৃত (বীর্য) থেকে বের হয় জীবন্ত মানুষ। অনুরূপ মৃত ডিম থেকে প্রথমে মুরগী, তারপর জীবন্ত মুরগী থেকে (মৃত) ডিম অথবা কাফের থেকে মু'মিন এবং মু'মিন হতে কাফের সৃষ্টি হয়। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, মুআ'য ﷺ নবী করীম ﷺ-কে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ার অভিযোগ করলে তিনি তাকে বললেন, তুমি [اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ] আয়াতটি পাঠ ক'রে এই দুআটি করো, رَحْمَنَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَرَحِيْمَهُمَا تُعْطِيْ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُمَا وَتَمْنَعُ مَنْ))

الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٢٧)

অপরিমিত জীবিকা দান করে থাক।'

لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللهِ الْمَصِيرُ (٢٨)

(২৮) বিশ্বাসী (মু'মিন)গণ যেন বিশ্বাসী (মু'মিন)দেরকে ছাড়া অবিশ্বাসী (কাফের)দেরকে অভিভাবক (বা অন্তরঙ্গ বন্ধু)রূপে গ্রহণ না করে।[৭৫] যে কেউ এরূপ করবে, তার সাথে আল্লাহর কোন সম্পর্ক থাকবে না। তবে ব্যতিক্রম, যদি তোমরা তাদের কাছ থেকে কোন ভয় আশংকা কর (তাহলে আত্মরক্ষার জন্য কৌশল অবলম্বন করতে পার।)[৭৬] আর আল্লাহ তাঁর নিজের সম্বন্ধে তোমাদেরকে সাবধান করছেন এবং আল্লাহর দিকেই (তোমাদের) প্রত্যাবর্তন।

قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٢٩)

(২৯) বল, 'তোমাদের মনে যা আছে, তা যদি তোমরা গোপন রাখ কিংবা প্রকাশ কর, আল্লাহ তা অবগত আছেন। আর আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, তাও তিনি অবগত আছেন এবং আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।'

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَداً بَعِيداً وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَاللهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ (٣٠)

(৩০) (স্মরণ কর সেদিনকে) যেদিন প্রত্যেক সেই ব্যক্তি, যে ভাল কাজ করেছে, সে তা উপস্থিত পাবে এবং যে মন্দ কাজ করেছে, (সেও তা বিদ্যমান পাবে।) সেদিন সে কামনা করবে, যদি তার ও ওর (দুষ্কর্মের) মধ্যে বহু দূর ব্যবধান হতো! বস্তুতঃ আল্লাহ তাঁর নিজের সম্বন্ধে তোমাদেরকে সাবধান করছেন। আর আল্লাহ দাসদের প্রতি অত্যন্ত অনুগ্রহশীল।

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ

(৩১) বল, 'তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর।[৭৭] ফলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং

تَشَاءُ، ارْحَمْنِي رَحْمَةً تُغْنِيْنِي بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ، اللَّهُمَّ أَغْنِنِيْ مِنَ الْفَقْرِ، وَاقْضِ عَنِّيْ الدَّيْنَ)) অপর আর এক বর্ণনায় এসেছে, "এটা এমন একটি দুআ যে, তোমার উপর উহুদ পাহাড় সমানও যদি ঋণ থাকে, মহান আল্লাহ সে ঋণকেও তোমার জন্য আদায় করার ব্যবস্থা করে দিবেন।" *(মাজমাউয যাওয়ায়েদ ১০/ ১৮৬ হাদীসের বর্ণনাকারীরা সবাই নির্ভরযোগ্য)*

(৭৫) আউলিয়া ওলীর বহুবচন। আর ওলী এমন বন্ধুকে বলা হয়, যার সাথে থাকে আন্তরিক ভালবাসা এবং বিশেষ সম্পর্ক। যেমন, মহান আল্লাহ নিজেকে ঈমানদারদের ওলী বলে ঘোষণা দিয়েছেন। [اَللهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ آمَنُوا]"আল্লাহ হলেন ঈমানদারদের ওলী।" আলোচ্য আয়াতের অর্থ হল, ঈমানদারদের পারস্পরিক ভালবাসা এবং বিশেষ সম্পর্ক থাকে। তারা আপোসে একে অপরের অন্তরঙ্গ বন্ধু। এখানে মহান আল্লাহ মু'মিনদেরকে কাফেরদের সাথে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। কারণ, কাফেররা আল্লাহর শত্রু এবং মু'মিনদেরও। সুতরাং তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করা কিভাবে বৈধ হতে পারে? আর এই কারণেই আল্লাহ তাআলা এই বিষয়টাকে কুরআনের আরো কয়েক স্থানে অতীব গুরুত্বের সাথে পেশ করেছেন। যাতে মু'মিনরা কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব এবং বিশেষ সম্পর্ক কায়েম করা থেকে বিরত থাকে। অবশ্য (পার্থিব) প্রয়োজন ও সুবিধার দাবীতে তাদের সাথে সন্ধি ও চুক্তি হতে পারে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের লেনদেনও। অনুরূপ যে কাফের মুসলিমদের সাথে শত্রুতা রাখে না, তার সাথে উত্তম ও সৌজন্যমূলক ব্যবহার করা বৈধ। (এর বিস্তারিত আলোচনা সূরা মুমতাহিনায় আছে।) কারণ, এ সব কার্যকলাপ (বন্ধুত্ব ও ভালবাসা থেকে) ভিন্ন জিনিস।

(৭৬) এই অনুমতি সেই মুসলিমদের জন্য যারা কোন কাফের দেশে বসবাস করে। যদি কোন সময় তাদের (কাফেরদের) সাথে বন্ধুত্বের প্রকাশ করা ব্যতীত তাদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব না হয়, তাহলে মৌখিকভাবে বন্ধুত্বের প্রকাশ করতে পারবে।

(৭৭) ইয়াহুদী এবং খ্রিষ্টান উভয় জাতিরই দাবী ছিল, আমরা আল্লাহ তাআলাকে ভালবাসি এবং মহান আল্লাহ আমাদেরকে ভালবাসেন। বিশেষ করে খ্রিষ্টানরা ঈসা এবং তাঁর মা মারয়্যাম (আলাইহিমাস্সালাম)-এর প্রতি ভক্তি ও ভালবাসায় এত বাড়াবাড়ি করল যে, তাঁদেরকে উপাস্যের আসনে বসিয়ে দিল। আর এটাও তারা এই মনে করে করত যে, এর দ্বারা তারা আল্লাহর নৈকট্য এবং তাঁর সন্তুষ্টি ও ভালবাসা লাভে ধন্য হতে পারবে। মহান আল্লাহ বললেন, কেবল মৌখিক দাবী এবং মনগড়া তরীকায় আল্লাহর ভালবাসা এবং তাঁর সন্তুষ্টি লাভ করা যায় না। এ সব লাভ করার পথ তো একটাই। আর তা হল, শেষ নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর ঈমান আনা এবং তাঁর অনুসরণ করা। এই আয়াতে সমস্ত ভালবাসার দাবীদারদের জন্য একটি পথই নির্দিষ্ট করা হয়েছে। অতএব আল্লাহর ভালবাসার অনুসন্ধানী যদি মুহাম্মাদ ﷺ-এর অনুসরণের মাধ্যমে তা অনুসন্ধান করে, তাহলে অবশ্যই সে সফল হবে এবং স্বীয় দাবীতে সত্য প্রমাণিত হবে। অন্যথা সে মিথ্যুক হবে এবং উদ্দেশ্য হাসিলেও ব্যর্থ হবে। নবী করীম ﷺ-এর উক্তিও হল, "যে ব্যক্তি এমন কোন কাজ করল, যে কাজের নির্দেশ আমি দিইনি, তার সে কাজ

لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣١)

তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করবেন।[৭৮] বস্তুতঃ আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'

قُلْ أَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ (٣٢)

(৩২) বল, 'তোমরা আল্লাহ ও রসূলের অনুগত হও।' কিন্তু যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে রাখ নিশ্চয়ই আল্লাহ অবিশ্বাসীদেরকে ভালবাসেন না।[৭৯]

إِنَّ اللهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ (٣٣)

(৩৩) নিশ্চয় আল্লাহ আদম, নূহ, ইব্রাহীমের বংশধর এবং ইমরানের বংশধরকে বিশ্বজগতে মনোনীত করেছেন।[৮০]

ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٣٤)

(৩৪) এরা হল পরস্পর পরস্পরের বংশধর[৮১] এবং আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা।

إِذْ قَالَتْ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّراً فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٣٥)

(৩৫) (স্মরণ কর) যখন ইমরানের স্ত্রী বলেছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার গর্ভে যা আছে, তা আমি একান্ত তোমার উদ্দেশ্যে স্বাধীন করার মানত করলাম।[৮২] সুতরাং আমার পক্ষ থেকে তা গ্রহণ কর, নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা।'

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ

(৩৬) অতঃপর যখন সে (ইমরানের স্ত্রী) ওকে (সন্তান) প্রসব করল, তখন সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি কন্যা প্রসব করেছি, বস্তুতঃ আল্লাহ সম্যক অবগত সে যা প্রসব করেছে। আর (ঐ কাঙ্ক্ষিত) পুত্র তো (এ) কন্যার মত নয়,[৮৩] আমি তার নাম

প্রত্যাখ্যাত।" *(বুখারী, মুসলিম)* অর্থাৎ, রসূল ﷺ-এর প্রদর্শিত তরীকা বহির্ভূত আমল প্রত্যাখ্যাত হবে; তথা আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না।

(৭৮) অর্থাৎ, রসূল ﷺ-এর অনুসরণ করার কারণে কেবল তোমাদের পাপই ক্ষমা করা হবে না, বরং তোমরা আল্লাহর ভালবাসার পাত্র হয়ে যাবে। আর কোন মানুষের আল্লাহর নিকট প্রিয় হয়ে যাওয়া যে অতীব উচ্চ মর্যাদা তাতে কোন সন্দেহ নেই।

(৭৯) এই আয়াতে আল্লাহর আনুগত্য করার সাথে সাথে রসূল ﷺ-এর অনুসরণ করার প্রতি পুনরায় তাকীদ ক'রে এ কথা পরিষ্কার ক'রে দেওয়া হয়েছে যে, এখন মুক্তির পথই হল কেবল মুহাম্মাদ ﷺ-এর অনুসরণ করা। আর এ থেকে বিমুখ হলে, তা হবে কুফরী এবং এমন কুফরীর কাফেরদেরকে আল্লাহ পছন্দ করেন না। তাতে তারা আল্লাহর ভালবাসা ও তাঁর নৈকট্য লাভের যতই দাবী করুক না কেন। এই আয়াতে তাদের প্রতি বড় তিরস্কার রয়েছে, যারা হাদীসকে হুজ্জত (শরীয়তের দলীল) মানে না এবং রসূল ﷺ-এর অনুসরণকেও জরুরী মনে করে না। উভয় শ্রেণীর মানুষই স্ব স্ব পদ্ধতিতে এমন মত ও পথ অবলম্বন করে যাকে কুফরী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আল্লাহ আমাদেরকে এ থেকে পানাহ দিন। আমীন।

(৮০) নবীদের বংশে ইমরান নামে দু'জনের আবির্ভাব ঘটেছিল। একজন হলেন মূসা এবং হারুন (আলাইহিমাস্ সালাম)-এর পিতা এবং দ্বিতীয়জন হলেন, মারয়্যাম (আলাইহাস্ সালাম)-এর পিতা। অধিকাংশ মুফাস্সিরগণের নিকট এই আয়াতে দ্বিতীয় ইমরানকে বুঝানো হয়েছে। এই বংশ মারয়্যাম (আলাইহাস্ সালাম) ও তাঁর পুত্র ঈসা ﷺ-এর কারণে সুউচ্চ মর্যাদা লাভ করেছে। মারয়্যামের মায়ের নাম মুফাস্সিরগণ হান্নাহ বিনতে ফাক্কুয লিখেছেন। *(তাফসীরে কুরত্বী ও ইবনে কাসীর)* এই আয়াতে মহান আল্লাহ ইমরানের বংশ ছাড়াও আরো তিনটি এমন বংশের কথা উল্লেখ করেছেন, যাদেরকে তিনি তাদের যুগে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলেন। এদের মধ্যে প্রথম হলেন আদম ﷺ। তাঁকে তিনি নিজ হাত দ্বারা সৃষ্টি ক'রে তাঁর মধ্যে স্বীয় রূহ সঞ্চার করেন। ফিরিশ্তামন্ডলী দ্বারা তাঁকে সিজদা করান। সকল জিনিসের নাম তাঁকে শিখিয়ে দেন এবং তাঁকে জান্নাতে বাসস্থান দান করেন। অতঃপর তাঁকে সেখান থেকে পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়। এতেও ছিল তাঁর বহু হিকমত। দ্বিতীয় হলেন, নূহ ﷺ। তাঁকে এমন সময় নবী করে প্রেরণ করেন, যখন মানুষ আল্লাহকে বাদ দিয়ে মূর্তিসমূহকে উপাস্য বানিয়ে নিয়েছিল। তাঁকে তিনি সুদীর্ঘ আয়ু দান করেছিলেন। তিনি তাঁর জাতির মাঝে সাড়ে ন'শ' বছর পর্যন্ত দ্বীনের তবলীগ করেছিলেন। কিন্তু অল্প কিছু লোক ছাড়া কেউ তাঁর প্রতি ঈমান আনেনি। শেষে তাঁর বদ্দুআয় ঈমানদার লোকগুলো ব্যতীত সমস্ত লোককে ডুবিয়ে ধ্বংস ক'রে দেওয়া হয়। ইব্রাহীম ﷺ-এর বংশ যে বৈশিষ্ট্য লাভে ধন্য হয়েছিল তা হল, মহান আল্লাহ পর্যায়ক্রমে তাঁর বংশ থেকে নবী ও বাদশাহ প্রেরণ করেন। বলা বাহুল্য, অধিকাংশ নবী তাঁরই বংশ থেকে প্রেরিত হয়েছিলেন। এমন কি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদ ﷺও ছিলেন তাঁর পুত্র ইসমাঈল ﷺ-এরই বংশধর।

(৮১) অথবা এর দ্বিতীয় অর্থ হল, দ্বীনের ব্যাপারে একে অপরের সহযোগী ও সাহায্যকারী।

(৮২) 'স্বাধীন করলাম'-এর অর্থ হল, তোমার উপাসনালয়ের খেদমতের জন্য ওয়াক্ফ করলাম।

(৮৩) এই বাক্যে আফসোস প্রকাশ করা হয়েছে এবং ওযরও। আফসোস এই জন্য যে, মেয়ে হয়েছে যা আমার আশার বিপরীত। আর ওযর পেশ করা হয়েছে এইভাবে যে, মানত করার উদ্দেশ্য ছিল তোমার সন্তুষ্টি লাভের লক্ষ্যে একজন খাদেম উৎসর্গ করা, আর এই কাজ একজন পুরুষই উত্তমভাবে সম্পাদন করতে পারে। এখন যা কিছু পেয়েছি, হে আল্লাহ! তুমি তো তা জানো। *(ফাতহুল ক্বাদীর)*

মারয়্যাম রেখেছি[৮৪] এবং অভিশপ্ত শয়তান হতে তার ও তার বংশধরদের জন্য তোমার পানাহ দিচ্ছি।'[৮৫]

وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (٣٦)

(৩৭) অতঃপর তার প্রতিপালক তাকে উত্তমরূপেই গ্রহণ করলেন এবং উত্তমরূপেই তার প্রতিপালন করলেন এবং তিনি তাকে যাকারিয়ার তত্ত্বাবধানে রাখলেন।[৮৬] যখনই যাকারিয়া মিহরাবে (কক্ষে) তার সঙ্গে দেখা করতে যেত, তখনই তার নিকট খাদ্য-সামগ্রী দেখতে পেত।[৮৭] সে বলত, 'হে মারয়্যাম! এসব তুমি কোথা থেকে পেলে?' সে বলত, 'তা আল্লাহর কাছ থেকে। নিশ্চয় আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপর্যাপ্ত জীবিকা দান করে থাকেন।'

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتاً حَسَناً وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقاً قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٣٧)

(৩৮) সেখানেই যাকারিয়া তার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তুমি তোমার নিকট থেকে সৎ বংশধর দান কর। নিশ্চয় তুমি প্রার্থনা শ্রবণকারী।'

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ (٣٨)

(৩৯) যখন (যাকারিয়া) মিহরাবে নামাযে রত ছিল, তখন ফিরিশ্তাগণ তাকে সম্বোধন ক'রে বলল, 'নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে ইয়াহয়্যার সুসংবাদ দিচ্ছেন,[৮৮] সে হবে আল্লাহর এক বাণী (ঈসা)র সমর্থক,[৮৯] সে হবে নেতা, জিতেন্দ্রিয় এবং পুণ্যবানদের মধ্যে একজন নবী।'

فَنَادَتْهُ الْمَلائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقاً بِكَلِمَةٍ مِنْ اللهِ وَسَيِّداً وَحَصُوراً وَنَبِيّاً مِنْ الصَّالِحِينَ (٣٩)

(৪০) সে (যাকারিয়া) বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার পুত্র হবে কিরূপে? আমার তো বার্ধক্য এসেছে এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা!'

قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ

---

(৮৪) হাফেয ইবনে কাসীর এই আয়াত এবং আরো অন্য হাদীসসমূহকে দলীল হিসেবে গ্রহণ ক'রে লিখেছেন যে, শিশুর নাম জন্মের প্রথম দিনেই রাখা উচিত। তিনি সাত দিনে নাম রাখার হাদীসকে দুর্বল সাব্যস্ত করেছেন। তবে হাফেয ইবনুল কাইয়্যেম এ ব্যাপারে হাদীসগুলিকে নিয়ে গবেষণা ক'রে শেষে লিখেছেন যে, প্রথম দিনে, তৃতীয় দিনে এবং সপ্তম দিনে নাম রাখা যায়। এ ব্যাপারে পথ প্রশস্ত। *(তুহফাতুল মাউলূদ)*

(৮৫) মহান আল্লাহ এই দুআ কবুল করেন। বলা বাহুল্য, হাদীসে এসেছে যে, "যখন কোন সন্তান জন্ম নেয়, তখন শয়তান তাকে স্পর্শ করে, ফলে সে চিৎকার ক'রে ওঠে। কিন্তু আল্লাহ তা'য়ালা শয়তানের এই স্পর্শ থেকে মারয়্যাম (আলাইহাস্ সালাম) এবং তাঁর পুত্র ঈসা ﷺ-কে রক্ষা করেছেন।" *(বুখারী ৩৪৩১, মুসলিম ২৩৬৬নং)*

(৮৬) যাকারিয়া ﷺ যেহেতু মারয়্যাম (আলাইহাস্ সালাম)-এর খালু ছিলেন এবং সেই সময়কার পয়গম্বরও। তাই সর্বোত্তম অভিভাবক ও তত্ত্বাবধায়ক হওয়ার জন্য তিনিই ছিলেন উপযুক্ত। মারয়্যাম (আলাইহাস্ সালাম)-এর আর্থিক প্রয়োজন এবং শিক্ষা ও নৈতিক তরবিয়াতের সমূহ দাবী পূরণের সঠিক যত্ন নেওয়া কেবল তাঁরই পক্ষে সম্ভব ছিল।

(৮৭) 'মিহরাব' বলতে ছোট একটি ঘর যেখানে মারয়্যাম (আলাইহাস্ সালাম) থাকতেন। 'রিয্ক্ব' (খাদ্য-সামগ্রী) বলতে ফলমূল। প্রথমতঃ এই ফলগুলো হত অসময়ের। গ্রীষ্মের ফল শীতে এবং শীতের ফল গ্রীষ্মের মৌসমে তাঁর ঘরে বিদ্যমান থাকত। দ্বিতীয়তঃ এই ফলগুলো না যাকারিয়া ﷺ এনে দিতেন, না অন্য কেউ। তাই তিনি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এগুলো কোত্থেকে এসেছে? তিনি বললেন, আল্লাহর পক্ষ হতে। এটা আসলে মারয়্যাম (আলাইহাস্ সালাম)এর একটি অলৌকিক ব্যাপার (কারামত) ছিল। অস্বাভাবিক অলৌকিক কার্যকলাপকে মু'জিযা ও কারামত বলা হয়। অর্থাৎ, বাহ্যিক ও সাধারণ কারণ-উপকরণ ছাড়াই যা ঘটে (তাই অতিপ্রাকৃত ও অনৈসর্গিক ঘটনা)। এটা যদি কোন নবীর জন্য সংঘটিত হয়, তাহলে তা হবে মু'জিযা। আর কোন ওলীর জন্য সংঘটিত হলে, তাকে বলা হয় কারামত। দু'টোই সত্য। তবে তা ঘটে আল্লাহর নির্দেশ ও তাঁর ইচ্ছাক্রমে। কোন নবী ও ওলীর এখতিয়ারে নেই যে, তাঁরা যখনই চাইবেন, তখনই তা সংঘটিত করতে পারবেন। এই জন্যই মু'জিযা ও কারামত এ কথা অবশ্যই প্রমাণ করে যে, যাঁদের জন্য তা সংঘটিত হয়, তাঁদের আল্লাহর নিকট রয়েছে বিশেষ সম্মান ও মর্যাদা। কিন্তু তার দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় না যে, আল্লাহর নিকট সম্মান লাভকারী এই বান্দারা সার্বভৌমত্বের কর্তৃত্বে কোন এখতিয়ার রাখেন। যেমন, বিদআতীরা আওলিয়াদের কারামতের মাধ্যমে সাধারণ লোকদেরকে এমন কিছু বুঝিয়ে তাদেরকে শির্কীয় আক্বীদায় লিপ্ত করে। এর আরো বিস্তারিত আলোচনা কোন কোন মু'জিযার বর্ণনার সাথে আসবে।

(৮৮) অসময়ের ফল দেখে যাকারিয়া ﷺ-এর অন্তরে (বার্ধক্যে পৌঁছে যাওয়া এবং স্ত্রী বাঁঝা হওয়া সত্ত্বেও) আশা জেগে উঠলো যে, তাঁকেও যেন মহান আল্লাহ এইভাবে (যেভাবে তিনি মারয়্যামকে অসময়ের ফল দিয়েছেন) কোন সন্তান দানে ধন্য করেন। সুতরাং মনের অজ্ঞাতসারে আল্লাহর সমীপে তাঁর দুআর মুখ খুলে গেল। আল্লাহ তাঁর এই দুআ কুবলও করলেন।

(৮৯) আল্লাহর এক বাণীর সমর্থন ও সত্যায়ন করার অর্থ, ঈসা ﷺ-কে সত্য বলে বিশ্বাস করা। অর্থাৎ, ইয়াহয়্যা ﷺ ঈসা ﷺ-এর চেয়ে বড় ছিলেন। তাঁরা আপোসে খালাতো ভাই ছিলেন। উভয়েই একে অপরকে সমর্থন করেছেন। سيِّد এর অর্থ সরদার বা জননেতা। حَصور এর অর্থ পাপসমূহ থেকে পবিত্র; যে পাপের কাছেও ঘেঁষে না। অর্থাৎ তাঁকে যেন পাপ থেকে নিবারিত রাখা হবে। কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন নপুংসক বা হিজড়া। কিন্তু তা সঠিক নয়। কারণ তা একটি দোষ, অথচ এখানে তাঁর উল্লেখ করা হয়েছে প্রশংসা ও ফযীলত হিসেবে। (অবশ্য জিতেন্দ্রিয় বা সংযমী অনুবাদ বেঠিক নয়।)

وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ (٤٠)

তিনি বললেন, 'এভাবেই। আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন।'

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ إِلاَّ رَمْزاً وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيراً وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالإِبْكَارِ (٤١)

(৪১) সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একটি নিদর্শন দাও।' তিনি বললেন, 'তোমার নিদর্শন এই যে, তিনদিন তুমি ইঙ্গিতে ব্যতীত লোকেদের সাথে কথা বলতে পারবে না। আর তুমি তোমার প্রতিপালককে অত্যধিক স্মরণ কর এবং সন্ধ্যায় ও প্রভাতে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।'[৯০]

وَإِذْ قَالَتْ الْمَلاَئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ (٤٢)

(৪২) (স্মরণ কর) যখন ফিরিশ্তাগণ বলেছিল, 'হে মারয়্যাম! আল্লাহ অবশ্যই তোমাকে মনোনীত ও পবিত্র করেছেন এবং বিশ্বের নারীদের মধ্যে তোমাকে নির্বাচিত করেছেন।[৯১]

يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ (٤٣)

(৪৩) হে মারয়্যাম! তোমার প্রতিপালকের অনুগত হও, (তাঁকে) সিজদা কর এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু কর।'

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ (٤٤)

(৪৪) এ অদৃশ্যলোকের সংবাদ যা তোমাকে অহী (ঐশীবাণী) দ্বারা অবহিত করছি। তুমি তাদের নিকট ছিলে না, যখন মারয়্যামের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব তাদের মধ্যে কে নেবে (তা দেখার জন্য) তারা তাদের কলম নিক্ষেপ করছিল এবং যখন তারা (এ ব্যাপারে) বাদানুবাদ করছিল, তখনও তুমি তাদের নিকট ছিলে না।[৯২]

إِذْ قَالَتْ الْمَلاَئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ

(৪৫) (স্মরণ কর) যখন ফিরিশ্তাগণ বলল, 'হে মারয়্যাম! নিশ্চয় আল্লাহ নিজের পক্ষ থেকে তোমাকে একটি কালেমা[৯৩] (দ্বারা সৃষ্ট সন্তানে)র সুসংবাদ দিচ্ছেন; যার নাম হবে মসীহ,[৯৪] মারয়্যাম-পুত্র

([৯০]) বার্ধক্যে মু'জিযা স্বরূপ সন্তান লাভের সুসংবাদ শুনে তাঁর ব্যাকুলতা বৃদ্ধি পেল এবং তিনি আল্লাহর কাছে নিদর্শন জানতে চাইলেন। মহান আল্লাহ বললেন, 'তিন দিনের জন্য তোমার জবান বন্ধ হয়ে যাবে। আর এটাই হবে আমার পক্ষ থেকে তোমার জন্য নির্দশন। তবে তুমি এই নীরবতায় সকাল ও সন্ধ্যায় অধিকমাত্রায় আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করো। যাতে যে নিয়ামত তুমি লাভ করতে যাচ্ছ, তার শুক্র আদায় হয়ে যায়।' অর্থাৎ, তাঁকে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে যে, মহান আল্লাহ তোমার চাওয়া অনুপাতে বহু নিয়ামত দানে তোমাকে ধন্য করেছেন, অতএব সেই হিসাবে তাঁর শুকরিয়াও বেশী বেশী কর।

([৯১]) মারয়্যাম (আলাইহাস্ সালাম)-এর এই মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব তাঁর যুগ অনুযায়ী ছিল। কেননা, সহীহ হাদীসে মারয়্যামের সাথে সাথে খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)কেও সর্বশ্রেষ্ঠা নারী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আর কোন কোন হাদীসে চারজন নারীকে সব দিক দিয়ে পূর্ণতাপ্রাপ্ত (কামেল) বলা হয়েছে। তাঁরা হলেন ঃ মারয়্যাম, আসিয়া (ফিরআউনের স্ত্রী), খাদীজা এবং আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহুন্না)। আর আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, সমস্ত নারীদের উপর তাঁর ফযীলত ও শ্রেষ্ঠত্ব ঐরূপ, যেরূপ (রুটি, গোশ্ত ও ঝোল মিশিয়ে প্রস্তুত এক প্রকার উপাদেয় খাদ্য) সারীদের শ্রেষ্ঠত্ব অন্য যাবতীয় খাদ্যের উপর। *(ইবনে কাসীর)* তিরমিযীর বর্ণনায় ফাতিমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)কেও শ্রেষ্ঠত্বপূর্ণ নারীদের মধ্যে শামিল করা হয়েছে। *(ইবনে কাসীর)* এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, উল্লিখিত নারীগণ এমন গরীয়সী নারী, যাঁদেরকে মহান আল্লাহ অন্যান্য সমস্ত নারীদের তুলনায় বিশেষ ফযীলত, মর্যাদা ও মাহাত্ম্য দান করেছিলেন। অথবা তাঁরা স্ব স্ব যুগে এই বিশেষ ফযীলত ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারিণী ছিলেন। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

([৯২]) বর্তমানের বিদআতীরা নবী করীম ﷺ-এর ব্যাপারে অতিরঞ্জন ক'রে তাঁকে মহান আল্লাহর মত আলেমুল গায়েব (অদৃশ্য জগতের জ্ঞানের অধিকারী) বলে মনে করে এবং বিশ্বাস করে যে, তিনি সব জায়গায় হাযির (উপস্থিত) এবং নাযির (তদারককারী)। এই আয়াত দ্বারা তাদের উভয় আক্বীদার পরিষ্কারভাবে খন্ডন করা হয়েছে। যদি তিনি 'আলেমুল গায়ব' হতেন, তাহলে আল্লাহ তাআলা এ কথা বলতেন না যে, "এ অদৃশ্যলোকের সংবাদ, যা তোমাকে অহী (ঐশীবাণী) দ্বারা অবহিত করছি।" কেননা, যিনি আগে থেকেই জানেন, তাঁকে এরূপ বলা হয় না। অনুরূপ যিনি হাযির (উপস্থিত) এবং নাযির (তদারককারী) তাঁকে এ কথা বলা যায় না যে, তুমি সেখানে উপস্থিত ছিলে না, যখন তারা লটারীর জন্য কলম নিক্ষেপ করছিল। লটারী করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল, কারণ মারয়্যামের লালন-পালন করার দাবীদার আরো কয়েকজন ছিল। [ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ] আয়াতে নবী কারীম ﷺ-এর রিসালাত এবং তাঁর সত্যতার প্রমাণও রয়েছে, যে ব্যাপারে ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানগণ সন্দেহ পোষণ করত। কেননা, শরীয়তের অহী কেবল পয়গম্বরের উপরেই আসে, অন্যের উপরে আসে না।

([৯৩]) ঈসা ﷺ-কে 'কালিমাতুল্লাহ' (আল্লাহর কালেমা) এই জন্য বলা হয়েছে যে, তাঁর জন্ম আল্লাহর অলৌকিক শক্তির প্রকাশ স্বরূপ, মানুষ সৃষ্টির নিয়ম-বহির্ভূত বিনা পিতায় মহান আল্লাহর বিশেষ কুদরতে 'কুন' কালেমা (বাণী) দ্বারা হয়েছে।

([৯৪]) مَسِيْحٌ (মাসীহ) مَسَحَ ধাতু থেকে গঠিত। খুব বেশী যমীনে ভ্রমণকারীকে বলা হয় مَسَحَ الأَرْضَ। অথবা এর অর্থ হল, হাত বুলিয়ে দেওয়া। কেননা, ঈসা ﷺ রোগীদেরর উপর হাত বুলিয়ে দিলে তারা আল্লাহর নির্দেশে আরোগ্য লাভ করত। এই উভয়

ঈসা। সে হবে ইহ-পরকালে সম্মানিত এবং সান্নিধ্যপ্রাপ্তগণের অন্যতম।

اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهاً فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمِنْ الْمُقَرَّبِينَ (٤٥)

(৪৬) সে (ঈসা) দোলনায় থাকা অবস্থায় ও পরিণত বয়সে মানুষের সাথে কথা বলবে[৯৫] এবং সে হবে পুণ্যবানদের একজন।'

وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلاً وَمِنْ الصَّالِحِينَ (٤٦)

(৪৭) সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! কেমন ক'রে আমার সন্তান হবে? অথচ কোন পুরুষ আমাকে স্পর্শ করেনি।' তিনি (আল্লাহ) বললেন, এভাবেই আল্লাহ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। তিনি যখন কিছু (সৃষ্টি করবেন বলে) স্থির করেন, তখন বলেন, 'হও', আর তখনই তা হয়ে যায়।[৯৬]

قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ- قَالَ كَذَلِكِ اللهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (٤٧)

(৪৮) তিনি (আল্লাহ) তাকে শিক্ষা দেবেন লিখন,[৯৭] প্রজ্ঞা, তওরাত ও ইঞ্জীল।

وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ (٤٨)

(৪৯) (তিনি) বনী ইস্রাইলদের জন্য তাকে রসূল করবেন। (সে বলবে,) আমি তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমাদের কাছে নিদর্শন এনেছি। আমি তোমাদের জন্য মাটি দ্বারা একটি পাখী সদৃশ আকৃতি গঠন করব,[৯৮] অতঃপর আমি তাতে ফুঁ দেব, ফলে আল্লাহর অনুমতিক্রমে তা পাখী হয়ে যাবে। আমি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ

وَرَسُولاً إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنْ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ

অর্থের দিক দিয়ে فَعِيل এখানে فَاعِـــل এর অর্থে ব্যবহার হয়েছে। কিয়ামতের নিকটতম সময়ে প্রকাশ লাভকারী দাজ্জালকে যে মাসীহ বলা হয়, সেটা হয় مَمسوح العَـــين (কানা) অর্থের দিক দিয়ে অথবা সেও যেহেতু সারা দুনিয়া ভ্রমণ করবে এবং মক্কা ও মদীনা ব্যতীত সব স্থানেই প্রবেশ করবে। *(বুখারী-মুসলিম)* কোন কোন বর্ণনায় বায়তুল মুক্বাদ্দাসেরও উল্লেখ আছে। এ জন্য তাকেও 'মাসীহুদ্ দাজ্জাল' বলা হয়। অধিকাংশ মুফাস্সিরগণ এই কথাটাই লিখেছেন। কোন কোন গবেষক বলেন, 'মাসীহ' ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদের পরিভাষায় আল্লাহ কর্তৃক নির্দেশপ্রাপ্ত বড় বড় পয়গম্বরদেরকে বলা হয়। অর্থাৎ, তাদের পরিভাষায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ পয়গম্বরদের কাছাকাছি অর্থে এটা ব্যবহার হয়। দাজ্জালকে 'মাসীহ' এই জন্য বলা হয় যে, ইয়াহুদীদেরকে বিপ্লব সৃষ্টিকারী সে মাসীহের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে এবং যার জন্য তারা এখনো পর্যন্ত ভ্রান্তিময় অপেক্ষায় রয়েছে, দাজ্জাল এই মাসীহর নাম নিয়েই আসবে। অর্থাৎ, সে নিজেকে তাদের সেই অপেক্ষিত মাসীহ বলেই প্রকাশ করবে। কিন্তু সে তার এই দাবী সহ অন্যান্য সমস্ত দাবীতে এত বড় প্রতারক ও ধোঁকাবাজ হবে যে, পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের মধ্যে তার কোন নজির মিলবে না। আর এই জন্য তাকে 'দাজ্জাল' (ভীষণ মিথ্যুক ও ধোঁকাবাজ) বলা হয়। عِيْسَى অনারবী শব্দ। কেউ কেউ বলেছেন, এটা আরবী শব্দ যা عَاسَ يَعُوْسَ ধাতু থেকে গঠিত এবং যার অর্থ হল, রাজনীতি ও নেতৃত্বদান। *(কুরতুবী ও ফাতহুল ক্বাদীর)*

(৯৫) ঈসা ﷺ-এর শিশু অবস্থায় দোলনায় কথা বলার ব্যাপারটা সূরা মারয়্যামেও উল্লিখিত হয়েছে। তাছাড়া সহীহ হাদীসে আরো দু'টি শিশুর কথা উল্লেখিত হয়েছে (যারা মায়ের কোলে কথা বলেছে)। একটি শিশু হল জুরায়েজ সম্পর্কিত ঘটনায় এবং অপরটি একজন ইস্রাঈলী মহিলার শিশু। *(বুখারী ৩৪৩৬নং)* এই বর্ণনায় যে তিনজন শিশুর কথা এসেছে, তাদের সকলের সম্পর্ক হল বানী-ইস্রাঈলদের সাথে। কারণ, সহীহ মুসলিম শরীফে 'আসহাবে উখদুদ' (গর্ত ওয়ালাদের) ঘটনাতেও একজন দুধের শিশুর বাক্যালাপ করার কথা এসেছে। আর ইউসুফ ﷺ-এর ব্যাপারে ফায়সালাকারী সাক্ষীও নাকি একজন শিশু ছিল; কথাটা প্রসিদ্ধ হলেও তা সঠিক নয়। বরং সে দাড়িওয়ালা ছিল। *(আযযায়ীফাহ ৮৮ ১নং)* كَهْلٌ (পরিণত বয়সে) কথা বলার অর্থ কেউ করেছেন, যখন তিনি বড় হয়ে অহী ও নবুঅত পেয়ে ধন্য হবেন তখনকার বাক্যালাপ। আবার কেউ বলেছেন, কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে যখন তিনি আসমান থেকে অবতরণ করবেন এবং তিনি ইসলামের তবলীগ করবেন, তখনকার বাক্যালাপকে বুঝানো হয়েছে; যেমন আহলে সুন্নাতের আক্বীদা এবং যা বহুধাসূত্রে বর্ণিত সহীহ হাদীস দ্বারা এ কথা প্রমাণিত। *(ইবনে কাসীর ও কুরতুবী)*

(৯৬) অর্থাৎ, তোমার আশ্চর্য হওয়া ঠিকই আছে, তবে মহাশক্তির অধিকারী আল্লাহর জন্য এটা কোন কঠিন ব্যাপার নয়। তিনি ইচ্ছা করলে স্বাভাবিক নিয়ম-নীতি ও বাহ্যিক হেতু ও উপকরণাদির মাধ্যমে ঘটনাঘটনের ধারাবাহিকতা খতম ক'রে কেবল 'কুন' (হও) নির্দেশ দ্বারা নিমেষে যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারেন।

(৯৭) كِتَابٌ এর অর্থ লিখন বা লেখা; যেমন অনুবাদে তা-ই গ্রহণ করা হয়েছে। অথবা কিতাব বলতে ইঞ্জীল ও তাওরাত ছাড়াও আরো একটি কিতাব যার জ্ঞান আল্লাহ ওদেরকে দিয়েছিলেন। *(কুরতুবী)* অথবা তাওরাত ও ইঞ্জীল হল 'কিতাব' আর 'হিকমাহ' তার তফসীর বা ব্যাখ্যা।

(৯৮) أَخْلُقُ لَكُمْ أَي: أُصَوِّرُ لَكُمْ "আমি তোমাদের জন্য আকৃতি বানাবো ও গঠন করব।" *(কুরতুবী)* অর্থাৎ, ক্রিয়াপদ خَلَـــقَ এখানে সৃষ্টি করার অর্থে ব্যবহার হয়নি। কারণ, সৃষ্টি করার ক্ষমতা তো কেবল মহান আল্লাহরই। তিনিই একমাত্র স্রষ্টা। সুতরাং এখানে خلق এর অর্থ বাহ্যিক আকৃতি গড়া ও বানানো।

فَيَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِ اللهِ وَأُبْرِئُ الأَكْمَهَ وَالأَبْرَصَ وَأُحْيِ الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٤٩)

ব্যাধিগ্রস্তকে নিরাময় করব এবং আল্লাহর অনুমতিক্রমে[৯৯] মৃতকে জীবন্ত করব। আর তোমরা তোমাদের গৃহে যা আহার কর ও জমা করে রাখ, তা তোমাদেরকে বলে দেব। নিশ্চয় এতে তোমাদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।

وَمُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ (٥٠)

(৫০) আর (আমি এসেছি) আমার পূর্বে (অবতীর্ণ) তওরাতের সত্যায়নকারীরূপে ও তোমাদের জন্য যা নিষিদ্ধ ছিল, তার কতকগুলিকে বৈধ করতে[১০০] এবং আমি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমাদের নিকট নিদর্শন এনেছি। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আর আমার অনুসরণ কর।

إِنَّ اللهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (٥١)

(৫১) নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার প্রতিপালক এবং তোমাদের প্রতিপালক। সুতরাং তোমরা তাঁর উপাসনা কর। এটাই হল সরল পথ।[১০১]

فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى

(৫২) অনন্তর যখন ঈসা তাদের অবাধ্যতার কথা উপলব্ধি করল,[১০২] তখন সে বলল, 'আল্লাহর পথে কারা আমার সাহায্যকারী হবে?'[১০৩] হাওয়ারী (শিষ্য)গণ[১০৪] বলল, 'আমরাই

---

(৯৯) দ্বিতীয়বার 'আল্লাহর অনুমতিক্রমে' বলার উদ্দেশ্য হল, কোন মানুষ যেন এমন ভুল বোঝার শিকার না হয়ে পড়ে যে, আমিও আল্লাহর গুণাবলী অথবা কোন এখতিয়ারের অধিকারী। না, আমি তো কেবল তাঁর একজন অক্ষম বান্দা এবং রসূল। আমার দ্বারা যা কিছু সংঘটিত হচ্ছে, তা হল নিছক মু'জিযা যা কেবল আল্লাহরই নির্দেশে সংঘটিত হয়। ইমাম ইবনে কাসীর বলেন, আল্লাহ তা'য়ালা প্রত্যেক নবীকে তাঁর যুগের অবস্থা ও পরিস্থিতি অনুযায়ী মু'জিযাসমূহ দান করেছিলেন। যাতে তাঁর সত্যতা ও মহত্ত্ব প্রকাশিত হয়। মূসা ﷺ-এর যুগে যাদু-বিদ্যার বড়ই চর্চা ছিল। তাই তাঁকে এমন মু'জিযা দান করেছিলেন যে, তাঁর সামনে যাদুকররা নিজেদের যাদুর ভেলকি দেখাতে অক্ষম প্রমাণিত হয়েছিল এবং এ থেকে তাদের নিকট মূসা ﷺ-এর সত্যতা পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছিল; ফলে তারা ঈমান এনেছিল। ঈসা ﷺ-এর যামানায় চিকিৎসা বিদ্যার বেশ চর্চা ছিল। তাই তাঁকে মৃতকে জীবিত করার এবং জন্মান্ধ ও ধবল-কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে সুস্থ ক'রে তোলার মু'জিযা দান করেছিলেন। আর এ কাজ কোন ডাক্তারই তার ডাক্তারী বিদ্যার দ্বারা করতে সক্ষম নয়, তাতে সে যত বড়ই বিশেষজ্ঞ হোক না কেন। আমাদের নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর যামানায় কবিতা, সাহিত্য এবং বাক্‌পটুতার খুবই চর্চা ছিল। তাই তাঁকে এমন মু'জিযাপূর্ণ কুরআন দান করলেন যা ছন্দে-মাধুর্যে এবং সাহিত্যে পরিপূর্ণ। যার নজীর পেশ করতে বিশ্বের বড় বড় সাহিত্যিক ও কবিরা অপারগ সাব্যস্ত হয়েছে। চ্যালেঞ্জ দেওয়া সত্ত্বেও আজও পর্যন্ত অপারগ সাব্যস্ত হয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত অপরাগই থাকবে। *(ইবনে কাসীর)*

(১০০) এ থেকে হয়তো সেই সব জিনিসকে বুঝানো হয়েছে, যা শাস্তি স্বরূপ মহান আল্লাহ তাদের উপর হারাম ক'রে দিয়েছিলেন। অথবা এমন সব জিনিস, যা তাদের আলেমরা নিজস্ব ইজতিহাদ বা বিবেচনার মাধ্যমে তাদের উপর হারাম ক'রে দিয়েছিল; যে ইজতিহাদে তারা ভুল ক'রে ফেলেছিল। ঈসা ﷺ তাদের ভুলকে দূর ক'রে সে জিনিসগুলো তাদের জন্য হালাল ক'রে দিয়েছিলেন। *(ইবনে কাসীর)*

(১০১) অর্থাৎ, আল্লাহর ইবাদত সম্পাদনে এবং তাঁর সামনে অসহায়তা ও অপরাগতার প্রকাশ করার ব্যাপারে আমি ও তোমরা সমান। সুতরাং এক আল্লাহর ইবাদত করা এবং তাঁর উপাস্যত্বে অন্য কাউকে শরীক না করাই হল সঠিক ও সরল পথ।

(১০২) অর্থাৎ, এমন গভীর ষড়যন্ত্র এবং সন্দেহজনক আচরণ যার ভিত্তিই ছিল কুফরী তথা মাসীহ ﷺ-এর রিসালাতকে অস্বীকার করার উপর।

(১০৩) বহু নবী স্বীয় জাতির ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে বাহ্যিক উপায়-উপকরণের ভিত্তিতে তাদেরই মধ্যেকার বিবেকবান ব্যক্তিদের কাছে সাহায্য-সহযোগিতা কামনা করেছেন। যেমন নবী মুহাম্মাদ ﷺ ও (ইসলামের) প্রাথমিক পর্যায়ে যখন কুরাইশরা তাঁর দাওয়াতের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তখন তিনি হজ্জের মৌসমে লোকদেরকে তাঁর সাথী ও সাহায্যকারী হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন। যাতে তিনি তাঁর প্রতিপালকের বাণী মানুষের নিকট পৌঁছাতে পারেন। আর তাঁর এই আহবানে সাড়া দিয়ে আনসারী সাহাবীগণ হিজরতের আগে ও পরে নবী কারীম ﷺ-কে সাহায্য করেছিলেন। অনুরূপ এখানে ঈসা ﷺ সাহায্য চেয়েছেন। তবে এই সাহায্য এমন সাহায্য নয়, যা কোন উপায়-উপকরণ ছাড়াই আসে। (এবং যে সাহায্য করার ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর নেই।) কারণ এ রকম সাহায্য সৃষ্টির কাছে চাওয়া শির্ক। আর প্রত্যেক নবীর আগমন ঘটেছে শির্কের দরজা বন্ধ করার জন্যই, অতএব তাঁরা কিভাবে শির্কীয় কাজ সম্পাদন করতে পারেন? কিন্তু কবরপূজারীদের ভ্রান্ত মতাদর্শ সত্যিই বড়ই দুঃখজনক যে, তারা মৃতদের নিকট সাহায্য চাওয়া বৈধতার প্রমাণে ঈসা ﷺ-এর مَنْ أَنْصَارِيْ إِلَى اللهِ উক্তিকে পেশ করে। সুতরাং 'ইন্না লিল্লাহি অইন্না ইলাইহি রা-জিউন। আল্লাহ তাদেরকে হিদায়াত দান করুন!

আল্লাহর পথে সাহায্যকারী হব। আমরা আল্লাহতে বিশ্বাস করেছি। আর আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম)।

اللهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللهِ آمَنَّا بِاللهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (٥٢)

(৫৩) হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি যা (ইঞ্জীল) অবতীর্ণ করেছ তাতে আমরা বিশ্বাস করেছি এবং আমরা রসূল (ঈসা)র অনুসারী। সুতরাং আমাদেরকে (সত্যতার) সাক্ষিদাতাদের তালিকাভুক্ত করে নাও।'

رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ (٥٣)

(৫৪) অতঃপর তারা ষড়যন্ত্র করল এবং আল্লাহও কৌশল প্রয়োগ করলেন। বস্তুতঃ আল্লাহ সর্বোত্তম কৌশলী।[১০৫]

وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (٥٤)

(৫৫) (স্মরণ কর) যখন আল্লাহ বললেন, 'হে ঈসা! নিশ্চয় আমি তোমার নির্দিষ্ট কাল পূর্ণ করব[১০৬] এবং আমার কাছে তোমাকে তুলে নেব এবং যারা অবিশ্বাস করেছে, তাদের মধ্যে থেকে তোমাকে পবিত্র (মুক্ত) করব।[১০৭] আর তোমার অনুসারিগণকে কিয়ামত পর্যন্ত অবিশ্বাসীদের উপর জয়ী করে রাখব,[১০৮] অতঃপর আমার কাছে তোমাদের প্রত্যাবর্তন (ঘটবে)। তার পর যে বিষয়ে তোমাদের মতান্তর ঘটেছে, তার মীমাংসা করে দেব।

إِذْ قَالَ اللهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنْ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (٥٥)

(৫৬) অনন্তর যারা অবিশ্বাস করেছে, আমি তাদেরকে ইহকাল ও পরকালে কঠোর শাস্তি প্রদান করব। আর তাদের কোন সাহায্যকারী

فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا

---

(১০৪) حَوَارِيُّوْنَ (হাওয়ারিয়্যুন) حَوَارِي (হাওয়ারী) শব্দের বহুবচন। যার অর্থ হল, সাহায্যকারী (শিষ্য)। যেমন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, "প্রত্যেক নবীর একজন বিশেষ সাহায্যকারী ছিল। আমার বিশেষ সাহায্যকারী হল যুবায়ের।" *(বুখারী ২৮৪৭, মুসলিম ২৪১৫নং)*

(১০৫) ঈসা ﷺ-এর যামানায় শাম (সিরিয়া) অঞ্চল রোমক শাসনের অন্তর্গত ছিল। এখানে রোমকদের পক্ষ থেকে যাকে শাসক নির্বাচিত করা হয়েছিল সে কাফের ছিল। ইয়াহুদীরা ঈসা ﷺ-এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন কথাবার্তা বলে এই শাসকের কান ভারী করল। যেমন, তিনি (নাঊযু বিল্লাহ) বিনা বাপের (জারজ সন্তান) এবং বড়ই ফাসাদী ইত্যাদি। শাসক তাদের দাবী অনুযায়ী তাঁকে শূলে চড়ানোর ফায়সালা গ্রহণ করে। কিন্তু মহান আল্লাহ ঈসা ﷺ-কে সযত্নে আসমানে উঠিয়ে নেন, আর এরা তাঁর স্থানে তাঁরই মত দেখতে অন্য এক ব্যক্তিকে শূলে চড়িয়ে দেয় এবং মনে করে যে, তারা ঈসা ﷺ-কে শূলে চড়িয়ে দিয়েছে। مَكْرٌ আরবী ভাষায় কোন কার্য সিদ্ধির জন্য সূক্ষ্ম ও গোপনভাবে তদবির (বা কৌশল অবলম্বন) করাকে বলা হয়। আর এই অর্থেই এখানে মহান আল্লাহকে خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ (সর্বোত্তম কৌশলী) বলা হয়েছে। পরন্তু কৌশল মন্দও হতে পারে, যদি মন্দ উদ্দেশ্যে হয় (আর তখন তাকে চক্রান্ত বা ষড়যন্ত্র বলা হয়) এবং ভালও হতে পারে, যদি তা ভাল উদ্দেশ্যে হয়।

(১০৬) المتوفى শব্দের মাসদার বা ক্রিয়া বিশেষ্য হল, توفى এবং এর মূলধাতু হল, وفى যার প্রকৃত অর্থ হল, পুরোপুরি কিছু নেওয়া। মানুষ মারা গেলে 'অফাত' শব্দ ব্যবহার করা হয়। কারণ, তার শারীরিক স্বাধীনতা সম্পূর্ণভাবে ছিনিয়ে নেওয়া হয়। এই দিক দিয়ে মৃত্যু কেবল মানুষের বিভিন্ন অবস্থার একটি অবস্থা। ঘুমের অবস্থায়ও যেহেতু মানুষের স্বাধীনতা কিছু কালের জন্য নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে, তাই ঘুমকেও কুরআন 'অফাত' বলে আখ্যায়িত করেছে। এ থেকে জানা গেল যে, এর যথাযথ ও প্রকৃত অর্থ হল, পুরোপুরি নেওয়া। [إِنِّيْ مُتَوَفِّيْكَ] আয়াতে 'অফাত'কে এই প্রকৃত অর্থেই ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ, হে ঈসা! আমি তোমাকে ইয়াহুদীদের চক্রান্ত থেকে পরিপূর্ণভাবে আমার কাছে আসমানে উঠিয়ে নিব। হলও তা-ই। আর কেউ কেউ 'অফাত'এর রূপকার্থের প্রসিদ্ধতার কারণে তার অর্থ মৃত্যুই করেছেন। তবে তারা বলেছেন, শব্দের মধ্যে আগে পিছে হয়ে আছে। অর্থাৎ, رَافِعُكَ (আমি আমার কাছে আসমানে উঠিয়ে নিব) এর অর্থ আগে হবে। আর مُتَوَفِّيْكَ এর অর্থ পরে হবে। অর্থাৎ, আমি তোমাকে আসমানে উঠিয়ে নিব। তারপর পুনরায় যখন দুনিয়াতে অবতরণ করবে, তখন তোমার মৃত্যু দান করব। অর্থাৎ, ইয়াহুদীদের হাতে তুমি নিহত হবে না, বরং তুমি স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করবে। (অফাতের আর এক অর্থ ঃ নির্দিষ্ট কাল পূর্ণ করা।) *(ফাতহুল ক্বাদীর, ইবনে কাসীর)* যেমন অনুবাদে এখতিয়ার করা হয়েছে।

(১০৭) এখানে সেই সমস্ত অপবাদ থেকে পবিত্রকরণকে বুঝানো হয়েছে, যা ইয়াহুদীরা তাঁর উপর আরোপ করত। সুতরাং শেষ নবী ﷺ-এর মাধ্যমে তাঁর পবিত্রতার কথা বিশ্ববাসীর সামনে পেশ ক'রে দেওয়া হয়। (অথবা পবিত্র করার অর্থ ঃ কাফেরদল থেকে তাঁকে মুক্ত করা, তাদের হাত থেকে তাঁকে বাঁচিয়ে নেওয়া।)

(১০৮) এ থেকে হয়তো ইয়াহুদীদের উপরে খ্রিষ্টানদের জয়ী থাকাকে বুঝানো হয়েছে। এরা ইয়াহুদীদের উপরে কিয়ামত পর্যন্ত জয়ী থাকবে; যদিও তারা তাদের ভ্রান্ত আক্বীদার কারণে আখেরাতে মুক্তি লাভ থেকে বঞ্চিত থাকবে। অথবা মুহাম্মাদ ﷺ-এর উম্মতের জয়ী থাকাকে বুঝানো হয়েছে; যারা ঈসা ﷺ এবং অন্যান্য সমস্ত নবীদেরকে সত্য বলে জানে এবং তাঁদের সঠিক ও অপরিবর্তিত দ্বীনে (ইসলামে)র অনুসরণ করে।

নেই।

وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (٥٦)

(৫৭) আর যারা বিশ্বাস করেছে এবং সৎকার্য করেছে, তিনি তাদের প্রতিদান পুরোপুরিভাবে প্রদান করবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ অত্যাচারিগণকে ভালবাসেন না।'

وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (٥٧)

(৫৮) যা আমি তোমার কাছে পাঠ করছি, তা হল আয়াত (নিদর্শনাবলী) ও বিজ্ঞানময় উপদেশ।

ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ (٥٨)

(৫৯) নিশ্চয় আল্লাহর নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের অনুরূপ। তিনি তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি ক'রে তার উদ্দেশ্যে বললেন, 'হও' ফলে সে হয়ে গেল।

إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (٥٩)

(৬০) (এ) সত্য তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে আগত, সুতরাং তুমি সংশয়ীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (٦٠)

(৬১) অনন্তর তোমার নিকট জ্ঞান আসার পর যে কেউ এ বিষয়ে (ঈসা সম্পর্কে) তোমার সাথে তর্ক করে, তাকে বল, 'এস, আমরা আহ্বান করি আমাদের পুত্রগণকে ও তোমাদের পুত্রগণকে, আমাদের নারীগণকে ও তোমাদের নারীগণকে, স্বয়ং আমাদেরকে ও স্বয়ং তোমাদেরকে, অতঃপর আমরা বিনীত প্রার্থনা করি যে, মিথ্যাবাদীদের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ হোক।'[১০৯]

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ (٦١)

(৬২) নিশ্চয়ই এ হল সত্য কাহিনী। আর আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন (সত্যিকার) উপাস্য নেই। আর নিশ্চয় আল্লাহ পরম প্রতাপশালী, প্রজ্ঞাময়।

إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلاَّ اللهُ وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٦٢)

(৬৩) অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় (অর্থাৎ, ঈসা সম্বন্ধে সত্য ইতিহাসকে অস্বীকার করে), তাহলে নিশ্চয় আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের সম্বন্ধে সম্যক অবহিত।

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ (٦٣)

(৬৪) তুমি বল, 'হে আহলে কিতাব (ধর্মগ্রন্থধারি)গণ! এস সে বাক্যের প্রতি যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে অভিন্ন; (তা এই যে,) আমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো উপাসনা করব না, কোন কিছুকেই তার অংশী করব না[১১০] এবং আমাদের কিছু লোক আল্লাহকে ছেড়ে অপর কিছু লোককে প্রভুরূপে গ্রহণ করবে না।'[১১১] অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে বল,

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا

---

(১০৯) এটাকে 'মুবাহালা'র আয়াত বলা হয়। মুবাহালার অর্থ হল, দুই পক্ষের একে অপরের প্রতি অভিসম্পাত করা। অর্থাৎ, দুই পক্ষের মধ্যে কোন বিষয়ের সত্য ও মিথ্যা হওয়ার ব্যাপারে তর্ক-বিতর্ক হলে এবং দলীলাদির ভিত্তিতে মীমাংসা না হলে, তারা সকলে মিলে আল্লাহর কাছে এই বলে দুআ করবে যে, 'হে আল্লাহ! আমাদের উভয়ের মধ্যে যে মিথ্যাবাদী, তার উপর তোমার অভিশাপ বর্ষণ হোক!' এর সংক্ষিপ্ত পটভূমি এই যে, ৯ম হিজরীতে নাজরান থেকে খ্রিষ্টানদের একটি প্রতিনিধিদল নবী করীম ﷺ-এর কাছে এসে তারা যে ঈসা ﷺ-এর ব্যাপারে অতিরঞ্জনমূলক আক্বীদা রাখত, সে নিয়ে তর্ক-বিতর্ক শুরু করে দিল। যার পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত নাযিল হয় এবং মহানবী ﷺ তাদেরকে মুবাহালার আহবান জানান। তিনি আলী, ফাতিমা এবং হাসান ও হুসাইন ﷺদেরকে সাথে নিয়ে মুবাহালার জন্য প্রস্তুত হয়ে আসেন এবং খ্রিষ্টানদেরকে বলেন যে, তোমরাও তোমাদের পরিবারের লোকদের সাথে নিয়ে এসো। তারপর আমরা মিথ্যাবাদীর উপর অভিশাপ বর্ষণের বদ্দুআ করব। খ্রিষ্টানরা আপোসে পরামর্শ ক'রে মুবাহালা করার পথ ত্যাগ ক'রে বলল যে, আপনি আমাদের কাছে যা চাইবেন, আমরা তা-ই দিব। সুতরাং রসূল ﷺ তাদের উপর জিযিয়া-কর ধার্য করে দেন। আর এই কর আদায়ের জন্য তিনি আমীনে উম্মত (উম্মতের বিশ্বস্তজন উপাধি লাভকারী) আবূ উবায়দা ইবনে জার্রাহ ﷺ-কে তিনি তাদের সাথে পাঠিয়ে দেন। *(ইবনে কাসীর এবং ফাতহুল ক্বাদীর ইত্যাদির সারাংশ)* পরের আয়াতে আহলে কিতাব (ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টান)দেরকে তাওহীদের প্রতি আহবান জানানো হচ্ছে।

(১১০) না কোন মূর্তিকে, না ক্রুশকে, না আগুনকে এবং না অন্য কোন কিছুকে। বরং কেবলমাত্র এক আল্লাহরই ইবাদত করব। আর এটাই ছিল প্রত্যেক নবীর দাওয়াত।

(১১১) প্রথম যে জিনিসটির প্রতি এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে তা হল, তোমরা ঈসা এবং উযায়ের (আলাইহিমাস্ সালাম)-এর রব্ব বা প্রতিপালক হওয়ার যে মনগড়া বিশ্বাস রাখ, তা সম্পূর্ণ ভুল। তাঁরা রব্ব ছিলেন না, বরং মানুষ ছিলেন। আর দ্বিতীয় যে জিনিসটির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, তা হল, তোমরা যে তোমাদের পন্ডিত ও সংসার-বিরাগীদেরকে হালাল ও হারাম করার

اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (٦٤)

'তোমরা সাক্ষী থাক যে, আমরা আত্ম-সমর্পণকারী (মুসলিম)।' (১১২)

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتْ التَّوْرَاةُ وَالإِنجِيلُ إِلاَّ مِنْ بَعْدِهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ (٦٥)

(৬৫) হে ঐশী গ্রন্থধারিগণ! ইব্রাহীম সম্বন্ধে তোমরা কেন বিতর্ক করছ, অথচ তাওরাত ও ইঞ্জীল তো তার পরেই অবতীর্ণ করা হয়েছিল? তোমরা কি বুঝ না? (১১৩)

هَـأَنْتُمْ هَـؤُلاءِ حَـاجَجْتُمْ فِـيمَا لَكُـمْ بِـهِ عِلْـمٌ فَلِـمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُـمْ بِـهِ عِلْـمٌ وَاللهُ يَعْلَـمُ وَأَنْـتُمْ لا تَعْلَمُونَ (٦٦)

(৬৬) তোমরা তো এমন যে, যে বিষয়ে তোমাদের কিছু জ্ঞান ছিল, সে বিষয়ে তর্ক করেছ। তাহলে যে বিষয়ে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই, সে বিষয়ে কেন তর্ক করছ? (১১৪) বস্তুতঃ আল্লাহ জ্ঞাত আছেন এবং তোমরা জ্ঞাত নও।

مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيّاً وَلا نَصْرَانِيّاً وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَمَا كَانَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ (٦٧)

(৬৭) ইব্রাহীম ইয়াহুদীও ছিল না, খ্রিষ্টানও ছিল না; সে ছিল একনিষ্ঠ, আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম)। (১১৫) সে অংশীবাদীদের দলভুক্ত ছিল না।

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَـذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ (٦٨)

(৬৮) যারা ইব্রাহীমের অনুসরণ করেছিল, তারা এবং এই নবী ও বিশ্বাসিগণ মানুষের মধ্যে ইব্রাহীমের ঘনিষ্ঠতম। (১১৬) আর আল্লাহ বিশ্বাসীদের অভিভাবক।

وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِـنْ أَهْـلِ الْكِتَـابِ لَـوْ يُضِـلُّونَكُمْ وَمَـا يُضِلُّونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (٦٩)

(৬৯) ঐশীগ্রন্থধারীদের একটি দল তোমাদেরকে বিপথগামী করতে চেয়েছিল; অথচ তারা তাদের নিজেদেরকেই বিপথগামী করে, কিন্তু তারা তা অনুভব করে না। (১১৭)

অধিকার দিয়ে রেখেছ, তা তাদেরকে রব্ব মনে করারই অন্তর্ভুক্ত। যেমন, [اتَّخَذُوا أَحْبَـارَهُمْ] আয়াতও এ কথার সাক্ষ্য দেয়। তাদের এ কাজও সঠিক নয়। কারণ, হালাল ও হারাম করার অধিকার একমাত্র আল্লাহর। *(ইবনে কাসীর ও ফাতহুল ক্বাদীর)*

(১১২) বুখারী শরীফের বর্ণনায় এসেছে যে, কুরআন কারীমের এই নির্দেশ অনুযায়ী রসূল ﷺ রোমক বাদশাহ হিরাকলের নিকটে পত্র প্রেরণ করেন এবং পত্রের মাধ্যমে এই আয়াতের দাবী অনুযায়ী তাকে ইসলাম কবুল করার প্রতি আহবান জানান। « فَأَسْلِمْ تَسْلَمْ، أَسلِمْ يُؤْتِكَ اللهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيسِـيِّينَ» "ইসলাম কবুল ক'রে নাও, নিরাপত্তা পাবে। মুসলিম হয়ে যাও, তাহলে মহান আল্লাহ তোমাকে দ্বিগুণ নেকী দিবেন। কিন্তু যদি তুমি ইসলাম স্বীকার না কর, তাহলে প্রজাদের পাপও তোমার উপর চাপবে।" *(বুখারী ৭নং)* কেননা, প্রজাদের ইসলাম স্বীকার না করার কারণই হবে তুমি। আলোচ্য আয়াতে তিনটি মৌলিক বিষয় উল্লিখিত হয়েছে, (ক) কেবলমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করা, (খ) তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করা এবং (গ) কাউকে শরীয়তী বিধান প্রণয়নের ইলাহী মর্যাদা না দেওয়া। এটাই সেই 'অভিন্ন বাক্য' যার উপর ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রতি আহলে-কিতাবদেরকে আহবান জানানো হয়েছে। সুতরাং এই শতধা-বিচ্ছিন্ন উম্মতকেও ঐক্যবদ্ধ করতে উক্ত তিনটি বিষয়কে এবং এই 'অভিন্ন বাক্য'কে অধিকরূপে মূল ভিত্তি ও বুনিয়াদ হিসাবে গ্রহণ করা উচিত।

(১১৩) ইব্রাহীম ﷺ-এর ব্যাপারে বিতর্কের অর্থ হল, ইয়াহুদী এবং খ্রিষ্টান উভয় জাতিই দাবী করত যে, তিনি তাদের ধর্মাবলম্বী ছিলেন। অথচ তাওরাত যার উপর ইয়াহুদীরা ঈমান রাখতো এবং ইঞ্জীল যেটাকে খ্রিষ্টানরা মান্য করে চলতো, এই উভয় গ্রন্থ ইব্রাহীম ﷺ-এর শত সহস্র বছর পর অবতীর্ণ হয়েছে। কাজেই তিনি ইয়াহুদী বা খ্রিষ্টান কিভাবে হতে পারেন? বলা হয় যে, ইব্রাহীম এবং মূসা (আলাইহিমাস্ সালাম)-এর মধ্যে এক হাজার বছরের ব্যবধান ছিল। আর ঈসা ও ইব্রাহীম (আলাইহিমাস্ সালাম)-এর মধ্যে দু'হাজার বছরের ব্যবধান ছিল। *(কুরতুবী)*

(১১৪) এই তো তোমাদের জ্ঞান ও দ্বীনদারীর অবস্থা যে, যে সম্পর্কে তোমাদের জ্ঞান আছে অর্থাৎ, নিজেদের দ্বীন ও কিতাবের ব্যাপারে, (যে কথা পূর্বোক্ত আয়াতে উল্লেখ হয়েছে) সে ব্যাপারে তোমাদের ঝগড়া করা ভিত্তিহীনও বটে এবং এতে অজ্ঞানতার পরিচয়ও রয়েছে। তাহলে যে ব্যাপারে তোমাদের মোটেই কোন জ্ঞান নেই, সে ব্যাপারে তোমরা কেন ঝগড়া কর? অর্থাৎ, ইব্রাহীম ﷺ-এর মান-মর্যাদা এবং তাঁর একনিষ্ঠ দ্বীনের ব্যাপারে; যার ভিত্তিই ছিল তাওহীদ ও ইখলাস।

(১১৫) [حَنِيفاً مُسْلِماً] (একনিষ্ঠ মুসলিম) অর্থাৎ, শির্ক থেকে বিমুখ হয়ে কেবল এক আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণকারী।

(১১৬) এই কারণেই কুরআন মাজীদে (সূরা নাহল ১২৩ আয়াতে) নবী করীম ﷺ-কে ইব্রাহীম ﷺ-এর মিল্লাতের অনুসরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। [أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً] এ ছাড়া হাদীসেও মহানবী ﷺ বলেছেন, "নবীদের মধ্য থেকে প্রত্যেক নবীর কিছু বন্ধু হয়, তাঁদের মধ্য থেকে আমার বন্ধু হল আমার পিতা এবং আমার মহান প্রতিপালকের খলীল (অতীব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ইব্রাহীম ﷺ)।" অতঃপর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন। *(তিরমিযী ২৯৯৫নং)*

(১১৭) ঈমানদারদের প্রতি ইয়াহুদীরা যে হিংসা ও বিদ্বেষ পোষণ করত এবং যার কারণে তারা মুসলিমদেরকে ভ্রষ্ট করতে চাইত, সে কথাই এই আয়াতে তুলে ধরা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, এইভাবে তারা নিজেরাই নিজেদেরকে ভ্রষ্টতার মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে; কিন্তু তারা টের পায় না।

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ (٧٠)

(৭০) হে ঐশীগ্রন্থধারীরা! তোমরা সত্য জানা সত্ত্বেও কেন আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার কর?[১১৮]

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٧١)

(৭১) হে আহলে কিতাব (ঐশীগ্রন্থধারীরা)! তোমরা কেন সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত কর এবং জেনে-শুনে সত্য গোপন কর?[১১৯]

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (٧٢)

(৭২) ঐশীগ্রন্থধারীদের এক দল বলে, 'যারা বিশ্বাস করেছে, তাদের প্রতি (অর্থাৎ, মুসলিমদের প্রতি) যা অবতীর্ণ হয়েছে দিনের প্রথম ভাগে তা বিশ্বাস কর এবং দিনের শেষ ভাগে তা অস্বীকার কর, হয়তো তারা (ইসলাম থেকে) ফিরতে পারে।[১২০]

وَلا تُؤْمِنُوا إِلاَّ لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٧٣)

(৭৩) আর যারা তোমাদের মতাদর্শের অনুসরণ করে, তাকে ব্যতীত আর কাকেও বিশ্বাস করো না।'[১২১] বল, 'নিশ্চয় আল্লাহর নির্দেশিত পথই (একমাত্র) পথ।'[১২২] (তারা এ কথাও বলে, 'তোমরা এও বিশ্বাস করো না যে,) তোমাদের যা দেওয়া হয়েছে অনুরূপ অন্য কাউকেও দেওয়া হবে[১২৩] অথবা তোমাদের প্রতিপালকের সম্মুখে তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুক্তি উত্থাপন করবে।' বল, 'অনুগ্রহ আল্লাহরই হাতে; তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।

([১১৮]) 'জেনে-শুনে আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার কর' এর অর্থ, তোমরা নবী করীম ﷺ-এর সত্যবাদিতা ও সত্যতা সম্পর্কে জানো, তা সত্ত্বেও কেন কুফরী বা অস্বীকার কর?

([১১৯]) এখানে ইয়াহুদীদের দু'টি অতি বড় অপরাধের প্রতি ইঙ্গিত ক'রে তাদেরকে তা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দান করা হচ্ছে। প্রথম অপরাধ হল, ন্যায়-অন্যায় এবং সত্য ও মিথ্যার মধ্যে মিশ্রিত করণ; যাতে মানুষের কাছে সত্য ও মিথ্যা পরিষ্কার না হয়। দ্বিতীয় অপরাধ হল, সত্যকে গোপন করা। অর্থাৎ, নবী করীম ﷺ-এর যে নিদর্শন ও গুণাবলী তাওরাতে লিপিবদ্ধ হয়েছে, তা মানুষ থেকে গোপন করা, যাতে কমসে-কম এই নিদর্শনাদির দিক থেকে যেন তাঁর সত্যতা প্রকাশ না হয়ে পড়ে। আর এই উভয় অপরাধ তারা জেনে-শুনেই করত। যার কারণে তারা বড়ই দুর্দশার শিকার হয়েছিল। তাদের অপরাধের কথা সূরা বাক্বারাতেও (৪২ আয়াতে) উল্লেখ হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, [وَلا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ] অর্থাৎ, "তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশিয়ে দিও না এবং জানা সত্ত্বেও সত্যকে গোপন করো না।" 'আহলে কিতাব' (ঐশীগ্রন্থধারী) শব্দটি কোন কোন মুফাস্সিরের নিকট ব্যাপক; যা ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টান উভয়কেই শামিল। অর্থাৎ, তাদের উভয়কেই এই অপরাধ থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। আবার কেউ বলেছেন, 'আহলে কিতাব' বলতে ইয়াহুদীদের সেই কয়েকটি গোত্রকে বুঝানো হয়েছে, যারা মদীনায় বসবাস করত। যেমন, বানী ক্বুরাইযা, বানী নাযীর এবং বানী ক্বাইনুক্বা। আর এই উক্তিকেই সঠিক বলে মনে হচ্ছে। কারণ, (বিভিন্ন কার্যকলাপের তাকীদে) মুসলিমদের সরাসরি সম্পর্ক এদের সাথেই ছিল এবং নবী করীম ﷺ-এর সাথে বিরোধিতায় এরাই ছিল অগ্রণী।

([১২০]) এখানে ইয়াহুদীদের আরো একটি এমন চক্রান্তের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যে চক্রান্তের মাধ্যমে তারা মুসলিমদেরকে বিভ্রান্ত করতে চাইত। তারা আপোসে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, সকালে মুসলিম হয়ে আবার সন্ধ্যায় কাফের হয়ে যাবে। এ থেকে মুসলিমদের অন্তরেও নিজেদের ইসলামের ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে যাবে। তারা ভাববে, এরা (ইয়াহুদীরা) ইসলাম গ্রহণ করার পর পুনরায় তাদের দ্বীনে ফিরে গেছে, অতএব হতে পারে ইসলামে বহু এমন দোষ-ত্রুটি আছে, যা তারা (ইয়াহুদীরা) জানতে পেরেছে।

([১২১]) এ কথা তারা আপোসে একে অপরকে বলত। অর্থাৎ, তোমরা বাহ্যিকভাবে অবশ্যই ইসলাম প্রকাশ কর, কিন্তু নিজেদের ধর্মাবলম্বী ছাড়া অন্য কারো কথা বিশ্বাস করো না।

([১২২]) এটা এমন এক স্বতন্ত্র বাক্য যার পূর্ব ও পরের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। কেবল তাদের চক্রান্ত ও হিলা-বাহানার প্রকৃতত্ব ব্যাপারে অবহিত করা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, বল, তোমাদের ছলনা ও প্রতারণায় কিছু হবে না। কারণ, হিদায়াত তো আল্লাহর হাতে। তিনি যাকে হিদায়াত দেবেন অথবা দিতে চাইবেন, তোমাদের হিলা-বাহানা তার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না।

([১২৩]) এটাও ইয়াহুদীদের একটি উক্তি। এর সম্পর্ক হল وَلاَ تُؤْمِنُوْا (---কাকেও বিশ্বাস করো না) বাক্যের সাথে। অর্থাৎ, এটাও বিশ্বাস করো না যে, যে নবুঅত ইত্যাদি তোমাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, তা অন্য কেউ পেতে পারে এবং ইয়াহুদী ধর্ম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম সত্য হতে পারে।

يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (٧٤)

(৭৪) যাকে ইচ্ছা তিনি নিজ করুণা দ্বারা নির্বাচিত করেন। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।'[১২৪]

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلاَّ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِماً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (٧٥)

(৭৫) ঐশীগ্রন্থধারীদের মধ্যে এমন লোক রয়েছে যে, তার কাছে বিপুল সম্পদ আমানত রাখলেও (চাওয়া মাত্র) সে ফেরৎ দেবে। পক্ষান্তরে তাদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যার নিকট একটি দীনার (স্বর্ণমুদ্রা)ও আমানত রাখলে তার পিছনে লেগে না থাকলে সে ফেরৎ দেবে না। কারণ, তারা বলে যে, 'এই অশিক্ষিত (অইয়াহুদী)দের অধিকার হরণে আমাদের কোন পাপ নেই।' বস্তুতঃ তারা জেনে-শুনে আল্লাহর নামে মিথ্যা বলে।[১২৫]

بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (٧٦)

(৭৬) অবশ্যই যে তার অঙ্গীকার পালন করে এবং সংযত হয়ে চলে, নিশ্চয় আল্লাহ সংযমীদেরকে ভালবাসেন।[১২৬]

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً أُوْلَئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ

(৭৭) যারা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথকে স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করে, পরকালে তাদের কোন অংশ নেই। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না, আর তাদের দিকে চেয়ে দেখবেন না এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধও করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।[১২৭]

([১২৪]) এই আয়াতের দু'টি অর্থ করা হয়। একটি হল, ইয়াহুদীদের বড় বড় পন্ডিতরা যখন তাদের শিষ্যদেরকে শিখাত যে, তোমরা সকালে মুসলিম হয়ে আবার সন্ধ্যায় কাফের হয়ে যেও, যাতে যারা সত্যিকারে মুসলিম হয়ে গেছে, তারাও সন্দিহানে পড়ে ইসলাম থেকে ফিরে যায়, তখন সেই শিষ্যদেরকে অতিরিক্ত তাকীদ এও করত যে, সাবধান! তোমরা কেবল বাহ্যিক মুসলিম হয়ো; সত্যিকারের নয়। বরং সত্যিকারে তোমরা ইয়াহুদীই থাকবে এবং কখনোও এ কথা মনে করো না যে, যে অহী ও শরীয়ত এবং যে জ্ঞান ও মর্যাদা তোমরা লাভ করেছ, তা অন্য কেউ লাভ করতে পারে অথবা তোমরা ব্যতীত অন্য কেউ সত্যের উপর আছে, যে তোমাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে হুজ্জত কায়েম ক'রে তোমাদেরকে মিথ্যা সাব্যস্ত করতে পারবে। এই অর্থের দিক দিয়ে মাঝে স্বতন্ত্র বাক্যটি ছাড়া عِنْدَ رَبِّكُمْ পর্যন্ত সম্পূর্ণটাই ইয়াহুদীদের কথা। দ্বিতীয় অর্থ হল, হে ইয়াহুদ সম্প্রদায়! তোমরা সত্যকে দাবানো ও মিটানোর জন্য যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছ এবং যেসব চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছ, তা কেবল এই জন্যই যে, প্রথমতঃ এ ব্যাপারে তোমরা দুঃখ ও হিংসা-জ্বালায় ভুগছ যে, যে জ্ঞান ও মর্যাদা, অহী ও শরীয়ত এবং যে দ্বীন তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছিল, তদ্রূপ জ্ঞান ও মর্যাদা এবং দ্বীন অন্যদেরকে কেন দেওয়া হল? দ্বিতীয়তঃ তোমরা আশঙ্কা কর যে, সত্যের এই দাওয়াত যদি অগ্রগতি লাভ করে এবং তার শিকড় যদি মজবুত হয়ে যায়, তাহলে শুধু যে দুনিয়া থেকে তোমাদের মান-মর্যাদা চলে যাবে তা নয়, বরং যে সত্যকে তোমরা গোপন ক'রে রেখেছ, তাও মানুষের কাছে প্রকাশ হয়ে যাবে। আর এ কারণেই মানুষ আল্লাহর কাছে তোমাদের বিরুদ্ধে হুজ্জত খাড়া করবে। অথচ তোমাদের জানা উচিত যে, দ্বীন ও শরীয়ত হল আল্লাহর অনুগ্রহ। এটা কারো উত্তরাধিকার সূত্রে লব্ধ জিনিস নয়, বরং তিনি তাঁর অনুগ্রহ যাকে ইচ্ছা দান করেন এবং এ অনুগ্রহ কাকে দেওয়া উচিত তাও তিনিই জানেন।

([১২৫]) أُمِّيِّينَ (নিরক্ষর-অশিক্ষিত) বলতে আরবের মুশরিকদেরকে বুঝানো হয়েছে। বিশ্বাসঘাতক ইয়াহুদীরা দাবী করত যে, এরা যেহেতু মুশরিক তাই তাদের সম্পদ আত্মসাৎ করা বৈধ, এতে কোন গুনাহ নেই। মহান আল্লাহ বললেন, এরা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলছে। অপরের সম্পদ আত্মসাৎ করার অনুমতি আল্লাহ কিভাবে দিতে পারেন? কোন কোন তফসীরের বর্ণনায় এসেছে যে, নবী করীম ﷺ এ কথা শুনে বললেন, "আল্লাহর শত্রুরা মিথ্যা বলেছে। কেবল আমানত ছাড়া জাহেলী যুগের সমস্ত জিনিস আমার পায়ের নীচে। আমানত সর্বাবস্থায় আদায় করতে হবে, তাতে তা কোন সৎ লোকের হোক বা অসৎ লোকের।" *(ইবনে কাসীর-ফাতহুল ক্বাদীর)* অনুতাপের বিষয় যে, ইয়াহুদীদের মত বর্তমানেও অনেক মুসলিম মুশরিকদের মাল আত্মসাৎ করার জন্য বলছে যে, 'দারুল হার্‌ব' (ইসলামের শত্রু কাফের দেশ)এ সূদ হালাল এবং শত্রুর মালের কোন হিফাযত নেই।

([১২৬]) 'অঙ্গীকার পালন করা'র অর্থ হল, সেই অঙ্গীকার রক্ষা করা যা আহলে-কিতাব (ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টান) এবং প্রত্যেক নবীর মাধ্যমে তাঁদের নিজ নিজ উম্মতের কাছ থেকে নবী করীম ﷺ-এর উপর ঈমান আনার ব্যাপারে নেওয়া হয়েছে। আর 'সংযত হয়ে চলা' (বা আল্লাহভীরুতা অবলম্বন করা)র অর্থ হল, মহান আল্লাহ কর্তৃক হারামকৃত জিনিস থেকে দূরে থাকা এবং রাসূলে করীম ﷺ কর্তৃক নির্দেশিত সমস্ত বিষয়ের উপর আমল করা। যারা এ রকম করে, তারা অবশ্যই আল্লাহর পাকড়াও থেকে রক্ষা পাবে এবং তাঁর প্রিয় বান্দা বলেও গণ্য হবে।

([১২৭]) উল্লিখিত লোকদের বিপরীত যারা, তাদের অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে। এরা হল দুই শ্রেণীর লোক। এক শ্রেণীর লোক এমন যারা আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার এবং নিজেদের কসমের কোন পরোয়া না ক'রে দুনিয়ার সামান্য স্বার্থের খাতিরে নবী করীম ﷺ-এর উপর ঈমান আনেনি। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক হল এমন যারা মিথ্যা কসম খেয়ে নিজেদের মাল বিক্রি করে অথবা কারো মাল আত্মসাৎ করে। যেমন, হাদীসে নবী করীম ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি কারো সম্পদ আত্মসাৎ করার জন্য মিথ্যা কসম খায়, সে আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, তিনি তার উপর ক্রোধান্বিত থাকবেন।" *(বুখারী ৭৪৪৫, মুসলিম*

يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ(٧٧)

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقاً يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنْ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنْ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (٧٨)

(৭৮) নিশ্চয় তাদের মধ্যে একদল লোক এমনও আছে যারা এরূপভাবে জিহ্বা বাঁকিয়ে কিতাব পাঠ করে, যাতে তোমরা মনে কর, তা আল্লাহর কিতাব; কিন্তু তা কিতাবের অংশ নয়। আর তারা বলে, 'তা আল্লাহর নিকট থেকে (সমাগত)'; কিন্তু তা আল্লাহর নিকট থেকে (সমাগত) নয় এবং তারা জেনে-শুনে আল্লাহর নামে মিথ্যা বলে।[১২৮]

مَا كَانَ لِبَشَرٍ- أَنْ يُؤْتِيَهُ اللهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَاداً لِي مِنْ دُونِ اللهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ(٧٩)

(৭৯) (হে ঐশীগ্রন্থধারিগণ!) কোন মানুষের পক্ষে এ হতে পারে না যে, আল্লাহ তাকে কিতাব, প্রজ্ঞা ও নবুঅত দান করেন, তারপর সে লোকদেরকে বলে, 'তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে আমার দাস হয়ে যাও।' বরং সে বলে, 'তোমরা রাব্বানী (আল্লাহ-ভক্ত) হও';[১২৯] যেহেতু তোমরা কিতাব শিক্ষা দাও এবং যেহেতু তোমরা অধ্যয়ন কর।[১৩০]

وَلا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَاباً أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (٨٠)

(৮০) আর তোমাদেরকে এও নির্দেশ দেবে না যে, 'ফিরিশ্তাগণ ও নবীগণকে প্রতিপালকরূপে গ্রহণ কর।' তোমাদের ইসলাম গ্রহণ করার পর সে কি তোমাদেরকে কুফরী করার আদেশ দেবে?[১৩১]

১৩৭নং) অনুরূপ তিনি বলেছেন, "তিন ব্যক্তির সাথে মহান আল্লাহ কথা বলবেন না, তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য হবে কঠিন শাস্তি। তাদের মধ্যে একজন হল এমন ব্যক্তি যে মিথ্যা কসম দ্বারা নিজের পণ্যসামগ্রী বিক্রি করে।" *(মুসলিম ১০৬নং)* আরো বিভিন্ন হাদীসে এ কথা বর্ণিত হয়েছে। *(ইবনে কাসীর-ফাতহুল ক্বাদীর)*

(১২৮) এখানে ইয়াহুদীদের সেই লোকদের কথা তুলে ধরা হয়েছে, যারা আল্লাহর কিতাবের (তাওরাতের) মধ্যে কেবল হেরফের ও পরিবর্তন সাধনই করেনি, বরং আরো দু'টি অপরাধ করেছে। তার একটি হল, বিকৃত উচ্চারণে মুখ বাঁকিয়ে কিতাব পাঠ করে এবং এ থেকে তারা সাধারণের মধ্যে বাস্তব পরিপন্থী প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়। দ্বিতীয়টি হল, তারা তাদের মনগড়া কথাগুলোকে আল্লাহর কথা বলে চালিয়ে দেয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ উম্মাতে মুহাম্মাদিয়ার মযহাবধারী উলামাদের মধ্যেও নবী করীম ﷺ-এর এই উক্তি "তোমরা পূর্ববর্তীদের তরীকার অনুসরণ করবে" অনুযায়ী অনেক এমন লোকও বিদ্যমান রয়েছে, যারা দুনিয়ার স্বার্থে অথবা মযহাবী পক্ষপাতিত্ব কিংবা ফিক্বাহকে বেশী শক্ত করে ধরে থাকার ফলে ক্বুরআন কারীমের সাথেও অনুরূপ আচরণ করে থাকে। তারা ক্বুরআনের আয়াত তো পড়ে; কিন্তু মসলা বয়ান করে নিজেদের মনগড়া। সাধারণ লোক মনে করে যে, মৌলভী সাহেব মসলা ক্বুরআন থেকেই বলছেন। অথচ বর্ণিত মসলার ক্বুরআনের সাথে কোন সম্পর্ক থাকে না। আবার কখনো অর্থের পরিবর্তন ঘটিয়ে অতি চমৎকার ভঙ্গিমায় পরিবেশন ক'রে এটাই বুঝাতে চেষ্টা করে যে, এ নির্দেশ আল্লাহর পক্ষ হতে! এ থেকে আল্লাহ আমাদেরকে পানাহ দিন। আমীন।

(১২৯) এখানে খ্রিষ্টানদের ব্যাপারে বলা হচ্ছে। তারা ঈসা ﷺ-কে প্রভু বানিয়ে রেখেছে। অথচ তিনি হলেন একজন মানুষ। তাঁকে কিতাব, হিকমত এবং নবুঅত দানে ধন্য করা হয়েছিল। আর এ দাবী কেউ করতে পারে না যে, আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমার পূজারী ও দাস হয়ে যাও, বরং তিনি তো এ কথাই বলেন যে, তোমরা আল্লাহ ওয়ালা হয়ে যাও। 'রব্বানী' রব্ব শব্দের সাথে সম্বদ্ধ। 'মুবালাগা' তথা আধিক্য বুঝানোর জন্য 'আলিফ' ও 'নুন'কে বৃদ্ধি করা হয়েছে। *(ফাতহুল ক্বাদীর)*

(১৩০) অর্থাৎ, আল্লাহর কিতাব শিখানো ও নিজেদের পড়ার ফলস্বরূপ প্রতিপালককে চেনা এবং তাঁর সাথে বিশেষ সম্পর্ক কায়েম হওয়া উচিত। অনুরূপ আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে জ্ঞাত ব্যক্তিদের জন্য অত্যাবশ্যক হল, তারা অন্য লোকদেরকেও তার শিক্ষা দেবে। এই আয়াত দ্বারা এ কথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, যখন আল্লাহর পয়গম্বরদের এ অধিকার নেই যে, তাঁরা লোকদেরকে তাঁদের ইবাদত করার নির্দেশ দেবে, তখন অন্য আর কারো এ অধিকার কিভাবে থাকতে পারে? (তফসীর ইবনে কাসীর)

(১৩১) অর্থাৎ, নবী, ফিরিশ্তা অথবা অন্য কাউকে আল্লাহর গুণাবলীর অধিকারী বিশ্বাস করানো কুফরী। তোমাদের ইসলাম গ্রহণ করার পর একজন নবী এ কাজ কি ক'রে করতে পারে? কারণ, একজন নবীর কাজ তো ঈমানের প্রতি আহ্বান করা। আর ঈমান হল সেই শরীকবিহীন এক আল্লাহর ইবাদত করার নাম। কোন কোন মুফাস্সির এই আয়াতের শানে নুযুল (পটভূমিকা) সম্পর্কে বলেছেন যে, কিছু মুসলিম নবী করীম ﷺ-এর নিকট তাঁকে সিজদা করার অনুমতি চাইলে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। *(ফাতহুল ক্বাদীর)* আবার কেউ কেউ এর শানে নুযুল সম্পর্কে বলেছেন, ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানরা একত্রিত হয়ে নবী করীম ﷺ-কে বলল, 'তুমি কি চাও যে, আমরা তোমার ঐভাবেই ইবাদত করি, যেভাবে খ্রিষ্টানরা ঈসার করে থাকে?' তখন তিনি বললেন, 'আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারো ইবাদত করা থেকে অথবা কাউকে এর নির্দেশ দেওয়া থেকে আমি তাঁর আশ্রয় কামনা করছি। মহান আল্লাহ না আমাকে এর জন্য পাঠিছেন, আর না এর নির্দেশ দিয়েছেন।' এই কথারই পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত নাযিল হয়। *(ইবনে কাসীর-সীরাতে ইবনে হিশাম)*

وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ(٨١)

(৮১) আর যখন আল্লাহ নবীদের নিকট থেকে অঙ্গীকার নিলেন যে, আমি তোমাদেরকে কিতাব ও প্রজ্ঞা দান করছি, অতঃপর তোমাদের কাছে যা আছে তার সমর্থকরূপে যখন একজন রসূল আসবে, তখন নিশ্চয় তোমরা তাকে বিশ্বাস ও সাহায্য করবে।[১৩২] তিনি বললেন, 'তোমরা কি স্বীকার করলে এবং আমার অঙ্গীকার গ্রহণ করলে?' তারা বলল, 'আমরা স্বীকার করলাম।' তিনি বললেন, 'তবে তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী রইলাম।'

فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٨٢)

(৮২) অতএব এর পর যারা মুখ ফিরিয়ে নেবে, তারাই হবে ফাসেক (সত্যত্যাগী)।[১৩৩]

أَفَغَيْرَ دِينِ اللهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (٨٣)

(৮৩) তারা কি আল্লাহর ধর্মের পরিবর্তে অন্য ধর্ম চায়? অথচ আকাশে ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে সমস্তই স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে![১৩৪] এবং তাঁরই কাছে তারা ফিরে যাবে।

قُلْ آمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (٨٤)

(৮৪) বল, 'আমরা আল্লাহতে এবং আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাঁর বংশধরগণের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছিল এবং যা মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীগণকে তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে প্রদান করা হয়েছে, তাতে বিশ্বাস করি,[১৩৫] আমরা তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না এবং আমরা তাঁরই নিকট আত্মসমর্পণকারী।'

---

(১৩২) অর্থাৎ, প্রত্যেক নবীর কাছ থেকে এই অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছে যে, তাঁর জীবদ্দশায় এবং তাঁর নবুঅতকালে যদি অন্য নবীর আবির্ভাব ঘটে, তাহলে এই নবাগত নবীর প্রতি ঈমান আনা এবং তাঁর সহযোগিতা করা অত্যাবশ্যক হবে। যদি নবী বিদ্যমান থাকা অবস্থায় নবাগত নবীর উপর ঈমান এই নবীর উপর জরুরী হয়, তাহলে এই নবীর উম্মতের উপর নবাগত নবীর উপর ঈমান আনা তো আরো বেশী জরুরী হয়ে যায়। কোন কোন মুফাস্সির رَسُوْلٌ مُصَدِّقٌ (সমর্থক রসূল) থেকে মুহাম্মাদ ﷺ-কে বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ, মুহাম্মাদ ﷺ-এর ব্যাপারে অন্য সমস্ত নবীদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছে যে, যদি তাঁর যুগে তিনি এসে যান, তাহলে নিজের নবুঅতের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে এই নবীর উপর ঈমান আনতে হবে। কিন্তু আসলে প্রথম অর্থের সাথে এই দ্বিতীয় অর্থ আপনা-আপনিই এসে যায়। সুতরাং কুরআনের শব্দের দিক দিয়ে প্রথম অর্থই সঠিক এবং এই অর্থের দিক থেকে এ কথাও পরিষ্কার হয়ে যায় যে, মুহাম্মাদ ﷺ-এর নবুঅতের সূর্য উদিত হওয়ার পর আর কোন নবীর (নবুঅতের) প্রদীপ উজ্জ্বল থাকবে না। যেমন, হাদীসে এসেছে যে, একদা উমার ﷺ তাওরাতের কয়েকটি পাতা নিয়ে পড়ছিলেন। তা দেখে নবী করীম ﷺ রাগান্বিত হয়ে বললেন, "সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! যদি মুসা ﷺও জীবিত হয়ে এসে যান আর তোমরা আমাকে ছেড়ে তাঁর অনুসারী হয়ে যাও, তাহলে অবশ্য অবশ্যই তোমরা ভ্রষ্ট হয়ে যাবে।" *(মুসনাদ আহমাদ, ইবনে কাসীর)* বলা বাহুল্য, এখন কিয়ামত পর্যন্ত অপরিহার্য অনুসরণ কেবল মুহাম্মাদ ﷺ-এরই করতে হবে। তাঁর আনুগত্যের মধ্যেই রয়েছে মুক্তি, কোন ইমামের অন্ধ অনুকরণ অথবা কোন বুযুর্গের হাতে বায়াত করার মধ্যে নয়। কোন পয়গম্বরের সিক্কা যদি না চলে, তাহলে অন্য কোন ব্যক্তিত্ব শর্তহীন আনুগত্যের অধিকারী কিভাবে হতে পারে?

(১৩৩) এখানে আহলে-কিতাব (ইয়াহুদী- খ্রিষ্টান) এবং অন্য সকল ধর্মাবলম্বীদের সতর্ক করা হচ্ছে যে, মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রেরণের পরও তাঁর উপর ঈমান না এনে স্ব স্ব দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা সেই অঙ্গীকারের বিপরীত, যা মহান আল্লাহ নবীদের মাধ্যমে প্রত্যেক উম্মতের কাছ থেকে নিয়েছেন এবং এই অঙ্গীকার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া কুফ্‌রী। আর এখানে 'ফাসেক্ব'এর অর্থ ঃ কাফের। কেননা, মুহাম্মাদ ﷺ-এর নবুওয়াতের অস্বীকৃতি কেবল 'ফিসক্ব' নয়, বরং একেবারে কুফ্‌রী।

(১৩৪) যখন আসমান ও যমীনের কোন জিনিসই আল্লাহ তাআলার কুদরত ও ইচ্ছার বাইরে নয় তাতে তা স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়, তখন তোমরা তাঁর সামনে ইসলাম কবুল করা থেকে বিরত কেন? পরের আয়াতে ঈমান আনার পদ্ধতি বর্ণনা ক'রে (প্রত্যেক নবী এবং প্রত্যেক অবতীর্ণ কিতাবের উপর কোন প্রকারের পার্থক্য না ক'রে ঈমান আনা জরুরী) বলা হচ্ছে যে, ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন আল্লাহর কাছে গৃহীত হবে না। অন্য কোন দ্বীন অবলম্বনকারীদের ভাগ্যে ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই জুটবে না।

(১৩৫) অর্থাৎ, প্রত্যেক সত্য নবীদের প্রতি এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে, তাঁরা স্ব স্ব সময়ে আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত ছিলেন। অনুরূপ তাঁদের উপর যে কিতাব ও সহীফা নাযিল হয়েছিল, তা সবই আসমানী কিতাব এবং বাস্তবিকই তা আল্লাহ কর্তৃক অবতীর্ণ। আর এ কথাও বিশ্বাস করতে হবে যে, সমূহ আসমানী কিতাবের মধ্যে কুরআন কারীম হল সর্বোত্তম কিতাব। এখন কেবল এই কিতাবের উপরই আমল হবে। কারণ, কুরআন পূর্বের সমস্ত কিতাবকে রহিত ক'রে দিয়েছে।

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ (٨٥)

(৮৫) যে কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম অন্বেষণ করবে, তার পক্ষ হতে তা কখনও গ্রহণ করা হবে না। আর সে হবে পরলোকে ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত।

كَيْفَ يَهْدِي اللهُ قَوْماً كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (٨٦)

(৮৬) বিশ্বাসের পর ও রসূলকে সত্য বলে সাক্ষ্যদান করার পর এবং তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন আসার পর যে সম্প্রদায় সত্য প্রত্যাখ্যান করে, (সে সম্প্রদায়কে) আল্লাহ কিরূপে সৎপথ প্রদর্শন করবেন? আল্লাহ সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না।

أُوْلَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (٨٧)

(৮৭) এ সকল লোকের প্রতিফল এই যে, এদের উপর আল্লাহ, ফিরিশ্তাগণ এবং সকল মানুষের অভিশাপ!

خَالِدِينَ فِيهَا لا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلا هُمْ يُنْظَرُونَ (٨٨)

(৮৮) তারা (নরকে) স্থায়ী হবে, তাদের শাস্তি লঘু করা হবে না এবং তাদের বিরামও দেওয়া হবে না।

إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٨٩)

(৮৯) তবে এরপর যারা তওবা করে ও নিজেদেরকে সংশোধন করে, সে ক্ষেত্রে আল্লাহ অবশ্যই বড় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[১৩৬]

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْراً لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَئِكَ هُمْ الضَّالُّونَ (٩٠)

(৯০) নিশ্চয় যারা বিশ্বাস করার পর অবিশ্বাস করে[১৩৭] এবং যাদের অবিশ্বাস-প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে, তাদের তওবা কখনো মঞ্জুর করা হয় না।[১৩৮] এরাই তো পথভ্রষ্ট।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الأَرْضِ ذَهَباً وَلَوْ افْتَدَى بِهِ أُوْلَئِكَ لَهُمْ

(৯১) নিশ্চয় যারা অবিশ্বাস করেছে এবং অবিশ্বাসী অবস্থায় মারা গেছে, তাদের কারো পক্ষ হতে পৃথিবী-পূর্ণ স্বর্ণ বিনিময়স্বরূপ প্রদান করলেও কখনো তা কবুল করা হবে না। এ সকল লোকের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং এদের কোন সাহায্যকারীও নেই।[১৩৯]

---

(১৩৬) আনসারদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি মুর্তাদ্দ (ধর্মত্যাগী) হয়ে মুশরিকদের সাথে মিলে যায়। কিন্তু সত্বর সে অনুতপ্ত হয় এবং লোকদের মাধ্যমে রসূল ﷺ-এর কাছে জানতে চায় যে, তার তাওবা কবুল হবে কি না? তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। এই আয়াতগুলো থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মুর্তাদ্দের শাস্তি যদিও অতি কঠিন, কারণ সে সত্যকে জানার পর বিদ্বেষ, ঔদ্ধত্য এবং অবাধ্যতাবশতঃ তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তবুও সে যদি পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে তওবা করে এবং নিজের সংশোধন করে নেয়, তাহলে মহান আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান; তিনি তার তওবা কবুল করবেন।

(১৩৭) এই আয়াতে তাদের শাস্তির কথা বলা হচ্ছে, যারা মুর্তাদ্দ হওয়ার পর তাওবা করার তাওফীক্ব লাভ থেকে বঞ্চিত হয়েছে এবং কুফ্‌রীর উপরেই যাদের মৃত্যু হয়েছে।

(১৩৮) এটা হল সেই তওবা যা মৃত্যুর সময়ে করা হয়। তাছাড়া তওবার দরজা তো সবার জন্য সব সময়ের জন্য খোলা। এর পূর্বের আয়াতেও তওবা কবুল হওয়ার প্রমাণ রয়েছে। এ ছাড়াও ক্বুরআনে মহান আল্লাহ বারবার তওবার গুরুত্ব এবং তা কবুল করার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, [أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ] অর্থাৎ, তারা কি এটা অবগত নয় যে, আল্লাহই নিজ বান্দাদের তওবা কবুল করে থাকেন এবং তিনিই দান-খয়রাত গ্রহণ করেন, আর আল্লাহ হচ্ছেন তওবা কবুলকারী ও পরম করুণাময়? *(সূরা তওবা ১০৪ আয়াত)* [وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوبَةَ عَنْ عِبَادِهِ] অর্থাৎ, তিনি তাঁর দাসদের তওবা গ্রহণ করেন এবং পাপ মোচন করেন এবং তোমরা যা কর তিনি তা জানেন। *(সূরা শূরা ২৫ আয়াত)* হাদীসসমূহে তওবা কবুল হওয়ার কথা বড়ই গুরুত্বের সাথে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। কাজেই এই আয়াতে যে তওবার কথা বলা হয়েছে, তা হল একেবারে শেষ মুহূর্তের তওবা, যা কবুল হবে না। যেমন, ক্বুরআনের অন্য এক স্থানে বলা হয়েছে, [وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ] {النساء: ١٨} "আর এমন লোকদের জন্য কোন তওবা নেই, যারা মন্দ কাজ করতেই থাকে, এমন কি যখন তাদের কারো নিকট মৃত্যু এসে উপস্থিত হয়ে যায়, তখন বলে, আমি এখন তওবা করছি।" হাদীসেও আছে যে, "অবশ্যই আল্লাহ বান্দার তওবা মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত কবুল ক'রে থাকেন।" *(মুসনাদ আহমাদ-তিরমিযী)* অর্থাৎ, জাকান্দানীর সময়ের তওবা কবুল হয় না।

(১৩৯) হাদীসে বর্ণিত যে, কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ একজন জাহান্নামীকে বলবেন, 'যদি তোমার কাছে সারা পৃথিবী পরিমাণ স্বর্ণ থাকে, তাহলে জাহান্নাম থেকে বাঁচার বিনিময়ে সে সমস্ত স্বর্ণ কি তুমি দিতে পছন্দ করবে?' সে বলবে, 'হ্যাঁ।' আল্লাহ তাআলা বলবেন, 'আমি তো দুনিয়ায় এর থেকেও সহজ জিনিস তোমার কাছে চেয়েছিলাম। কেবল এই যে, আমার সাথে কাউকে শরীক করো না। কিন্তু তুমি শির্ক থেকে বিরত থাকনি।' *(মুসনাদ আহমাদ, অনুরূপ হাদীস বুখারী ও মুসলিমেও বর্ণিত*

عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (٩١)

হয়েছে।) এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কাফেরের জন্য হবে জাহান্নামের চিরস্থায়ী আযাব। সে দুনিয়াতে কোন ভাল কাজ ক'রে থাকলেও কুফ্‌রীর কারণে তার সে ভাল কাজ বরবাদ হয়ে যাবে। যেমন, হাদীসে বর্ণিত যে, আব্দুল্লাহ ইবনে জাদআন; যে বড়ই অতিথিপরায়ণ, গরীব-অভাবীদের প্রতি উদার এবং ক্রীতদাস স্বাধীনকারী ছিল তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল যে, এই ভালকাজগুলো তার কোন উপকারে আসবে কি? নবী করীম ﷺ বললেন, "না।" কারণ, সে একদিনও স্বীয় প্রতিপালকের কাছে নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেনি। *(মুসলিম)* অনুরূপ কেউ যদি কিয়ামতের দিন সারা পৃথিবী পরিমাণ স্বর্ণ বিনিময় স্বরূপ দিয়ে জাহান্নাম থেকে বাঁচতে চায়, তাও সম্ভব হবে না। প্রথমতঃ সেখানে মানুষের কাছে থাকবেই বা কি? আর যদি মেনেই নেওয়া যায় যে, তার কাছে পৃথিবী পরিমাণ ধন-ভান্ডার হবে, যা দিয়ে সে নিজেকে আযাব থেকে বাঁচিয়ে নিতে চাইবে, তবুও সে বাঁচতে পারবে না। কারণ, তার কাছ থেকে বিনিময় গ্রহণ করাই হবে না। যেমন, অন্যত্র আল্লাহ বলেন, [وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ] "কারোও কাছ থেকে বিনিময় গৃহীত হবে না এবং কারোও সুপারিশ ফলপ্রদ হবে না।" *(সূরা বাক্বারাহ ১২৩)* [لاَ بَيْعٌ فِيْهِ وَلاَ خِلاَلٌ] "যেদিন না কোন বেচাকেনা হবে, আর না বন্ধুত্ব (উপকারে আসবে)।" *(সূরা ইব্রাহীম ঃ ৩১)*